অন্তরতমা

সুমন্ত আসলাম

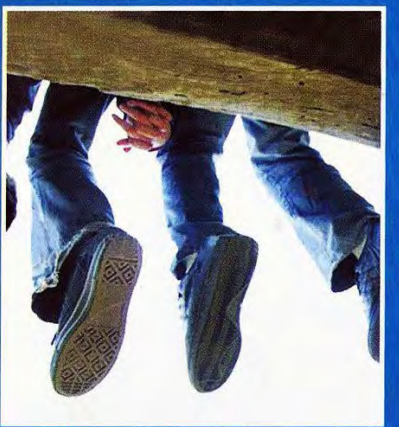

প্রিয় পাঠক, আপনি ধরেই নিয়েছেন এটা একটি প্রেমের উপন্যাস, ভালোবাসার উপন্যাস। তারপর আপনি পড়তে শুরু করলেন। আপনার সামনে রিমিকা বসু এলেন, আবিন চৌধুরী এলেন, সাহাবুদ্দিন সাহেব এলেন, আনিকা এলো, একসময় রাহাদ আর অন্তীও এলো।

এবার নড়েচড়ে বসলেন আপনি। ভালোই তো লাগছে– প্রেমের কথা, ভালোবাসার কথা। মাঝে মাঝে আনমনাও হয়ে যাচ্ছেন, স্মৃতিকাতরতায় ভুগছেন, রোমাঞ্চিতও হচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ করে আপনার খেয়াল হলো– উপন্যাসটা ঠিক কেমন যেন। ভালোবাসা আছে, প্রেম আছে, আরো অনেক কিছু আছে। উপন্যাসের প্রতি মনোযোগ বেড়ে গেল আপনার। উপন্যাসের যতই শেষের দিকে যাচ্ছেন আপনি, ততই আষ্টেপৃষ্ঠে ধরছেন বইটা, শেষে কী আছে, শেষে কী আছে, ভাবতেই ভাবতেই একসময় শেষ করে ফেললেন। ভাবতে বসে গেলেন আপনি, গভীর ভাবনা।

আপনার প্রতি চ্যালেঞ্জ– ভালো লাগুক অথবা না লাগুক, মনে মনে বলবেন, এরকম অন্য ধাঁচের ভালোবাসার উপন্যাস কখনো পড়েননি আপনি।

প্রমিজ!

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১১

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১১

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১১

অন্তরতমা

সুমন্ত আসলাম

স্বত্ব © লেখক

অন্বেষা ২৪৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯২৭

প্রচ্ছদ
সুহর্ষ সৌম্য

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
ঐশী প্রিন্টার্স
পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ১৩৫.০০ টাকা মাত্র

Antortoma by Sumanto Aslam.
First Published February Book Fair 2011
Mohammed Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.
www.anneshaprokashon.com
e-mail annesha_prokashon@yahoo.com

Price : Tk. 135.00 only **US $06.00**
ISBN 978 984 7116 18 1 Code 244

সম্ভবত এ জীবনে দু-তিনবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। প্রতিবারই কথা হয়েছে—অল্প কথা। কিন্তু ভালো লাগাটা অসীম। এ ভালো লাগাটা শুধু আমার না, সবার। সবাই তাঁর প্রশংসা করে, সবাই তাঁর কর্মে মুগ্ধ!

প্রিয় কামাল ভাই, প্রিয় মোস্তফা কামাল সৈয়দ

মুগ্ধ সবাই করতে পারে না। মুগ্ধ করার জন্য কিছু গুণ থাকা দরকার। আপনার আছে সেসব, একটু বেশিই আছে।

বিরক্তি নিয়ে দরজার দিকে তাকালেন রিমিকা বসু। খটখট শব্দ হচ্ছে দরজায়। গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছিলেন তিনি। কাজটা করতে করতেই তিনি বললেন, 'কে?'

'মাম, আমি।'

'রাহাদ!' কাজটা ফেলে দ্রুত উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন রিমিকা বসু। পর্দা সরানোর পর আলোয় ভরা ঘরের মতো আলোকিত হয়ে উঠল ঘরটা। রাহাদের চিবুকের মাঝখানে একটা খাঁজ আছে। সুযোগ পেলেই সেখানে একটা আঙুল রাখেন তিনি। এখনো রাখলেন। রাহাদ হাসতে হাসতে বলল, 'রেডি হও, মাম।'

'রেডি হবো!' একটু কপাল কুঁচকে রিমিকা বসু বললেন, 'কেন?'

'তোমাকে খুব আনন্দের একটা কথা বলব আমি, এখন, জাস্ট নাও।'

ছেলের হাত ধরে বিছানায় বসালেন রিমিকা বসু। তারপর খুব মমতা নিয়ে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব আনন্দের!'

'হ্যাঁ মাম, খুবই আনন্দের।' আনন্দ নিয়ে বলতে বলতে রাহাদ নিজের মাথার চুলগুলো দেখিয়ে বলল, 'তার আগে বলো তো মাম, আমার চুলগুলো তোমার কেমন লাগছে?'

'সুন্দর।'

'শুধু সুন্দর!'

'না, খুব সুন্দর।' মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে রিমিকা বসু বললেন, 'চুলের কালারটাও সুন্দর হয়েছে, কাটিংটাও।'

'কালারটা কিন্তু আমি চয়েস করিনি।'

ফেলে রাখা কাজটা হাতে নিচ্ছেলেন রিমিকা বসু। সেটা আগের জায়গায় রেখে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'কে চয়েস করে দিয়েছে?'

রাহাদ হেসে উঠল। সব মানুষের হাসি মুখ সুন্দর, কিছু কিছু মানুষের একটু বেশি সুন্দর। রাহাদের হাসি বেশি সুন্দর। রিমিকা বসু রাহাদের চিবুকের খাঁজে আবার হাত রাখলেন। চিবুকে রাখা মায়ের হাতটা দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাহাদ বলল, 'মাম, খুব অনেস্টলি একটা কথা বলবে?'

রিমিকা বসু চোখ দুটো একটু ছোট করে ছেলের দিকে তাকালেন। রাহাদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ওভাবে তাকাচ্ছো কেন, মাম! অ্যানিথিং রং?'

গলার স্বরটা বেশ গম্ভীর করে রিমিকা বসু বললেন, 'তোমার কি মনে হয় আমার কথার মাঝে কোনো ধরনের ডিসঅনেস্টি কাজ করে?'

'আমি ওটা মিন করিনি, মাম।' রাহাদ মায়ের হাতটা নিজের দু হাতের ভেতর আরো আঁটোসাঁটোভাবে চেপে ধরে বলে, 'কিন্তু একটা কথা খুব সত্য, মাম। কোনো মানুষ যদি ডিসঅনেস্ট হয় তাহলে তার প্রথম ডিসঅনেস্টি শুরু হয় তার কথা থেকে। লাইক পলেটেশিয়ান। তাদের ডিসঅনেস্টিই শুরু হয় তাদের ভাষণ থেকে, সেই ভাষণে দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে।'

'তুমি জানো, তারপরও তোমাকে বলছি, আমি কিন্তু রাজনীতিবিদ নই, রাজনীতিবিদ কোনো আত্মীয়ও নেই আমার।' রিমিকা বসু একটু রূঢ় স্বরে বললেন, 'রাজনীতি আমি পছন্দও করি না।'

'স্যরি, মাম।'

'ইটস ওকে।' রাহাদের মুখটাতে একবার হাত বুলিয়ে রিমিকা বসু বলেন, 'সততা হচ্ছে মানুষের মানবীয় অলংকার। অনেক ক্ষেত্রে এই সততাই মানুষকে অন্যরকম পাল্টে ফেলে। তোমার বাবসের সঙ্গে রিলেশন হওয়ার তিন মাস পর আমি জেনেছি তোমার বাবস হচ্ছে অন্য রিলিজনের। কিন্তু ততদিনে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি, বিয়ে করলে তাকেই করব। আমার জন্ম-জন্মান্তের সব বন্ধন ছিন্ন করে শেষ পর্যন্ত আমি তোমার বাবসকেই বিয়ে করেছি। কেবল আমি আমার নামটা ছিন্ন করিনি— রিমিকা বসুই রেখেছি। অবশ্য তোমার বাবসও কখনো এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি আমাকে। আজ চব্বিশ বছর হতে চলল সেই যে বাড়ি থেকে এক কাপড়ে বের হয়ে এসেছিলাম, ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা, বেড়াতেও যাওয়া হয়নি নিজের জন্মঘরে, কেউ নিতেও আসেনি কখনো।' চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে রিমিকা বসুর, 'অথচ যা কিছু করেছি তোমার বাবসের প্রতি সৎ থেকেই করেছি, নিজের সততা থেকেই করেছি।'

'তোমার কি মন খারাপ করে দিলাম, মাম?'

ছেলের মুখটাতে আবার হাত বুলিয়ে রিমিকা বসু বলেন, 'মোটেই না।'

'তোমাকে প্রথম কে প্রপস করেছিল?' রাহাদ সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'ইফ ইউ হেজিটেট, প্লিজ ক্যানসেল দিজ কোয়েশ্চেন। কিন্তু আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, মাম।'

মুখটা স্থির থাকলেও চোখ দুটো হেসে ওঠে রিমিকা বসুর। সেই হাসি হাসি চোখ নিয়ে ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার বাবস।'

'একটু এক্সপ্লেইন করবে প্লিজ।'

'ভার্সিটিতে প্রথম ভর্তি হলাম। মফস্বল থেকে এসেছি, সব কিছুই নতুন আর রঙিন লাগছে। তুমি তো জানো তোমার বাপস খুব চমৎকার করে কথা বলতে পারেন। আমাকে একা পেয়ে একদিন কিছু কথা বললেন।'

'কথাগুলো বলা যাবে?' রাহাদ হাসতে থাকে।

'বলা যাবে, কিন্তু বলব না। এর মাঝে তুমি কোনো কারণ-অকারণ খুঁজতে যেও না। এত বছর পরও মনে হয় কথাগুলো শুধু আমার জন্য, তাই ওগুলো আমার মাঝেই থাকা উচিত।' রিমিকা বসু একটু সোজা হয়ে বসে বলেন, 'বাই দ্য বাই, কী যেন একটা কথা অনেস্টলি শুনতে চেয়েছ তুমি?'

'আমি কি খুব বোকা, মাম?'

রিমিকা বসু জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে যান তিনি। নেইল কাটার দিয়ে নখ কাটতে কাটতে ঘরে ঢুকে আনিকা বলল, 'আম্মু, ড্যাড চা খাবে, গ্রিন টি।'

'আর কিছু?'

'আমাকে বলেনি।'

'তোমরাও নিশ্চয় খাবে।' রিমিকা বসু জবাব শোনার জন্য এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। আবিন চৌধুরী সবকিছু সহ্য করতে পারেন, কিন্তু চা দিতে দেরি হলে সহ্য করতে পারেন না। প্রথম দিকে চা দিতে দেরি হলে চেহারা গম্ভীর করে রাখতেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন না তিনি। একদিন একটু বেশি দেরি হওয়ায় দোতালা থেকে কাপটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নিচে।

নখ কাটতে কাটতে রাহাদের পাশে বসে আনিকা বলল, 'তোকে নিয়ে একটা প্লান করেছি আমি। তুই পাঁচ মিনিট একদম চুপ হয়ে বসে থাকবি, আমার নখ কাটা শেষ হলেই প্লানটা বলব আমি।'

'এটা তোমার কততম প্লান বলো তো আ-আপু?'

'যততমই হোক এটা আমার শেষ প্লান।'

'আ-আপু শোনো— ।' হাত দিয়ে ইশারা করে রাহাদকে থামিয়ে দিয়ে আনিকা বলল, 'তোর এই আ-আপু শুনলে মাথা গরম হয়ে যায় আমার। শুধু আপু ডাকলে কী হয়, আ-আপু ডাকার মানে কী !'

'আ-আপু মানে আনিকা আপু। আনিকার আ নিয়ে আ-আপু। সেদিন আমরা একটা বিয়ের পার্টিতে গেলাম না। তোমাকে আনিকা আপু বলে ডাকতেই পাশ থেকে একটা মেয়ে আমাকে বলেন, আমাকে ডাকছেন? আইডিয়াটা তখনই মাথা থেকে আসে। এরকম অনেক পার্টিতে যেতে হবে আমাদের। আনিকা নামে কমপক্ষে এক লাখ মেয়ে আছে বাংলাদেশে। ধরো আমরা কোনো একটা পার্টিতে গিয়েছি। সেখানে তোমাকে আনিকা আপু নামে ডাক দিলাম। দেখা গেল একসঙ্গে তিনটা মেয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে, এমনকি আমার দিকে এগিয়েও আসছে, তাদের তিনজনের নামই আনিকা। সেজন্যই তোমাকে সংক্ষিপ্ত করে ডাকা— আ-আপু। সেভাবেই পাশের বাসার নিতু আপু নি-আপু, চার তলার প্রিয়ন্তি আপু প্রি-আপু।'

'শুনতে কেমন লাগে না!'

'প্রথম প্রথম একটু খারাপই লাগবে। কিন্তু তুমি কি জানো আর মাত্র কয়েক বছর পর মানুষের কোনো নাম থাকবে না।'

'নাম না থাকলে আইডেন্টিফাই করবে কীভাবে?'

'কোড নম্বর দিয়ে। যেমন তোমার কোড নং ধরো ০০৯২১। আমার কোড নং ০০৬৪৫। পৃথিবীতে যে হারে মানুষ বাড়ছে তাতে একদিন নতুন কোনো নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন কোডই ব্যবহার করতে হবে। দেখো না, ফেসবুকে আমরা যদি কাউকে খুঁজতে যাই তাহলে একটা নাম লেখার সঙ্গে সঙ্গে ওই নামের অন্তত ছবিসহ পাঁচজনের লিস্ট দেখা যায়। অনেকের আবার ছবিও থাকে না। যাকে খুঁজছ তার চেহারা যদি তোমার চেনা না থাকে তাহলে একেবারে পাজলের মধ্যে পড়ে যাবে তুমি!'

'ওই কোডটা দেবে কী পদ্ধতিতে?'

'সেটা এরই মধ্যে কেউ না কেউ বের করে ফেলবে।

'সম্ভবত খুব একটা খারাপ হবে না ব্যাপারটা। কেউ যখন আমাকে ডাকবে ০০৯২১, খুব মজা লাগবে তখন। কিন্তু কোড নম্বরটা মনে রাখা বেশ টাফ হবে।'

'আমরা কি সবার নামও সবসময় মনে রাখতে পারি। কোনো কোনো সময় একটা নাম মনে করার জন্য আমরা চুলও টানতে থাকি।' রাহাদ আনিকার নখ কাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপু, তোমার পাঁচ মিনিট কিন্তু শেষ, এবার তোমার প্লানটা বলো?'

নখ কাটা বাদ দিয়ে আনিকা রাহাদের দিকে তাকায়। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে চোখ দুটো বুজে ফেলে সে। কোনো কিছু বন্ধ থাকলে সেখান দিয়ে পানি বের হয় না, মানুষের চোখ হচ্ছে এমন একটা জিনিস সেটা বন্ধ থাকলেও সেখান থেকে পানি বের হয়। আনিকার চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে, ও কাঁদছে। রাহাদ অবাক হয়ে বলল, 'আ-আপু তুমি কাঁদছ! কিন্তু কাঁদার তো কোনো কারণ দেখছি না।'

এতক্ষণ নীরবে কাঁদছিল আনিকা, এবার শব্দ করে কেঁদে ওঠে সে। রাহাদের একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'তুই এত ভালো কেন বল তো! তুই জানিস না ভালো মানুষরা পৃথিবীতে বেশি দিন বেঁচে থাকে না!'

হেসে ফেলে রাহাদ। আনিকার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার চোখ দুটো আগে মুছে ফেলো, তারপর তোমাকে একটা প্রশ্ন করব।'

চোখ মুছতে মুছতে আনিকা বলল, 'বল।'

'প্রতিটা মানুষই কিছু না কিছু বোকা। কিন্তু একটা মানুষ কখন সবচেয়ে বোকা হয় বলো তো?' খুব আগ্রহ নিয়ে রাহাদ আনিকার দিকে তাকায়। আনিকা গভীরভাবে রাহাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মানুষ তখনই সবচেয়ে বোকা হয় যখন সে প্রেমে পড়ে।'

রাহাদ একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমার দিকে ভালো করে তাকাও তো দেখি। আমাকে কি বোকার মতো দেখাচ্ছে?'

আনিকা অবাক স্বরে বলল, 'তুই কি প্রেমে পড়েছিস?'

'আমি তো সেটা বলিনি।'

'তাহলে বোকার প্রশ্ন আসছে কেন?'

'এমনি।' ছোট্ট করে উত্তর দিয়ে রাহাদ উঠে দাঁড়ায়। কিছুটা ধীরপায়ে নিজের ঘরে দিকে এগিয়ে যায় সে। আনিকা অবাক চোখে ওর চলে যাওয়া দেখে। কেমন যেন একটা ঘোরের মাঝে হেঁটে গেল ও। কিন্তু ওর একুশ বছরের জীবনে এভাবে কখনো হাঁটতে দেখেনি ওকে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রিমিকা বসু। দরজায় খুট করে শব্দ হলো। সাধারণত অল্প শব্দতেই ঘুম ভেঙে যায় তার। এখনো ভেঙে গেল। পাশে রাখা মোবাইলটা জ্বেলে দেখলেন রাত দেড়টা। কিছুটা চমকানোর ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'কে?'

'মাম, আমি?'

'রাহাদ!' বিছানা থেকে দ্রুতগতিতে নেমে দরজা খুলে রাহাদকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বললেন, 'শরীর খারাপ লাগছে তোমার!'

'না, মাম।'

'রাত তো অনেক হয়ে গেছে, ঘুমাওনি যে!'

'ঘুম আসছে না, মাম।'

'কেন!' রিমিকা বসু ছেলের হাত চেপে ধরে ঘরের ভেতর আনতে চাইলেন। রাহাদ স্থির থেকে মাকে বলল, 'বাবস কি ঘুমিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি কি একটু আমার ঘরে আসবে?'

হাত ধরেই রিমিকা বসু ছেলের ঘরে এলেন। বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'এত রাত পর্যন্ত জেগে আছো তুমি, কোনো প্রবলেম? তোমার চেহারার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন লাগছে আমার।'

'কোনো প্রবলেম নেই, মাম। বিকেলে তোমাকে একটা আনন্দের কথা বলতে চেয়েছিলাম, বলা হয়নি। কথাটা না বলা পর্যন্ত কমফোর্ট ফিল করছি না, ঘুমও আসছে না। খুব আনন্দের কথা বলার মতো তেমন তো কেউ নেই আমার। কথাটা তাই তোমাকেই বলতে চাচ্ছি, মাম।'

রাহাদের মাথার চুলগুলোর ভেতর হাত ঢুকিয়ে রিমিকা বসু খুব মিষ্টি হেসে বললেন, 'স্যরি, কথাটা আমার বিকেলেই শোনা উচিত ছিল। নাও, আই অ্যাম রেডি। প্লিজ, টেল মি।'

মাথাটা নিচু করে ফেলল রাহাদ। তারপর মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলল, 'মাম, আই ইন লাভ। ঠিক তোমার মতোই সুন্দর চোখের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছি আমি। ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি কমেন্ট?'

'নো কমেন্ট।' দরজার কাছ থেকে আবিন চৌধুরী মুখটা হাসি হাসি করে ঘরে ঢুকলেন। হাত বাড়িয়ে ছেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কনগ্রাটস, কনগ্রাচুলেশন মাই সান!'

খুব সকালে ঘুম থেকে সে কবে উঠেছে সেটা মনে নেই অন্তীর। যত তাড়াতাড়িই ঘুমাক না কেন ঘুম থেকে উঠতে অন্তত নয়টা। কোনো কোনো দিন দশটা, এমনকি এগারটাও। জগতে যতগুলো আনন্দের বিষয় আছে তার কাছে ঘুমই হচ্ছে সবচেয়ে আনন্দের।

কিন্তু আজকে তার খুব ভেঙেছে খুব সকালে। ভোরের আলো তখনো ফোটেনি, পাখির কলরবও শুরু হয়নি, রাতের অন্ধকার তখনও দখল করে আছে থোকা থোকা ভাবে। অনেক রাত করে ঘুমিয়েছে সে, তবুও এত সকালে ঘুম ভাঙার একটা কারণ আছে। জীবনকে নতুন করে চেনার, পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে দেখার, সবকিছুকে ভালো লাগার একটা ঘটনা ঘটেছে তার জীবনে। কেউ একজন ভালোবাসার কথা বলেছে, ভালোবাসি বলেছে তাকে।

ঘড়ির দিকে তাকাল অন্তী। ছ'টা বেজে বিশ মিনিট। সকাল নয়টায় সে বাসা থেকে বের হবে। প্রায় এ তিন ঘণ্টা বাসায় কী করবে ভাবতেই কপালটা কুঁচকে ফেলল সে। তিন ঘণ্টা অনেক সময়!

পুব পাশের জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল অন্তী। পুবের আকাশটা অল্প অল্প লাল হয়ে উঠেছে। দু-একটা পাখিও ডাকছে। তবে সবচেয়ে বেশি ডাকছে কাক। ঢাকা শহর যত জঙ্গলময় হয়ে উঠছে কাকের সংখ্যাও তত বেড়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো কাক একসঙ্গে চেচাচ্ছে, কোনোদিন কাকের ডাক ভালো লাগেনি তার, কিন্তু আজ লাগছে।

মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে জানালা দিয়ে। গন্ধটা চেনার চেষ্টা করল অন্তী, চিনতে পারল না। এ বিল্ডিংয়ের আশপাশে অনেক গাছ আছে, বেশির ভাগই ফুলের গাছ, সম্ভবত কোনো একটা ফুলের গন্ধ হবে ওটা। দীর্ঘ সময় ধরে শ্বাস নিয়ে গন্ধটা আবার চেনার চেষ্টা করল সে, চিনতে পারল না এবারও।

বিছানার পাশে রাখা মোবাইলটা হাতে নিল অন্তী। অন করল। একটা মেসেজ এসেছে রাতে—'সারারাত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

জানালার কাচে শিশির ঝরা দেখেছি, প্রতিটি শিশিরের শব্দ আমি কান পেতে শুনেছি। শুনেছি আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি— কেউ একজন কিছু একটা বলবে বলে, কেউ একজন হৃদয়ের সব আকুলতা নিয়ে ভালোবাসি বলবে বলে।'

মনটা আরো ভালো হয়ে গেল অন্তীর। প্রজাপতির মতো উড়তে ইচ্ছে করছে তার, নাচতেও ইচ্ছে করছে। মেসেজটা আবার পড়ল সে, আবার মন ভালো হয়ে গেল তার, আবার প্রজাপতি হতে ইচ্ছে করল, আবার নাচতে ইচ্ছে করল।

কলিংবেল বেজে উঠল। আলতো করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকাল সে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে নিজেকে দেখে দরজার দিকে পা বাড়াল। আই হোল দিয়ে বাইরেরটা দেখে খুলে ফেলল দরজাটা। একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তাকে দেখে চমৎকার করে হেসে মেয়েটি বলল, 'শুভ সকাল। আমি রিয়া।'

তাৎক্ষণিকভাবে রিয়াকে চিনতে পারল না অন্তী। ব্যাপার বুঝতে পারল সে। আগের মতোই হেসে সে একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'হোম সার্ভিস পয়েন্ট থেকে এসেছি আমি।'

'অ। আসুন আসুন।' দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে অন্তী রিয়ার মতো হাসতে হাসতে বলল, 'ফ্ল্যাটটা চিনতে আপনার কষ্ট হয়নি তো?'

'একটু হয়েছে। এ এলাকায় তেইশ নম্বর রোড আছে দুটো। মূল রাস্তা থেকে একটা ডান দিকে, আরেকটা বাম দিকে। আমি প্রথমে ডান দিকেরটায় গিয়েছিলাম।' রিয়া মিষ্টি করে হাসে আবার।

দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল অন্তী, তার আগেই রিয়া সেটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'আজ থেকে এটা বন্ধ করার ডিউটি আমার।'

'আমার মনে হয় ডিউটিটা শুরু করার আগে ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখা দরকার।' অন্তী সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দেখাতে লাগল রিয়াকে। সবকিছু দেখানোর পর অন্তী বলল, 'কোনো কমেন্টস?'

'আপনার জন্য ফ্ল্যাটটা বেশ বড় হয়ে গেছে। যদিও বড় ফ্ল্যাটে বাস করার মধ্যে অন্যরকম একটা আনন্দ আছে।'

'মেইনটেইন করার কষ্টও আছে।'

রিয়া বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলল, 'তার জন্য হোম সার্ভিস পয়েন্ট আছে, আমরা আছি। আমি যতদিন আছি ততদিন এ ফ্ল্যাট মেইনটেইন নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না আপনার। হোম সার্ভিস পয়েন্টে আমাদের জয়েন করার আগেই কমিটমেন্ট নিয়ে নেয়— আমরা যে ফ্ল্যাটেই

কাজ করি না কেন, যতদিনই করি না কেন, ফ্ল্যাটটা নিজের মনে করতে হবে। খুব সত্য কথা হচ্ছে আমরা নিজেদের ঘর যতটা না যত্ন করি তার চেয়ে বেশি করি হোম সার্ভিস পয়েন্ট থেকে দায়িত্ব পাওয়া ঘরগুলোতে।'

'আমি আপনাকে কিছু কাজ বুঝিয়ে দেব। তার আগে আমরা কি এককাপ কফি খেতে পারি?' অন্তী সাদা সোফাটায় বসতে বসতে বলল।

'অবশ্যই। কিচেন কেবিনেটে দু ধরনের কফি দেখেছি আমি। আপনার পছন্দ কোনটা?' অন্তীর পাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল রিয়া।

'আমাদের প্রথম খাবার পর্বটা আপনার পছন্দেই হোক।'

'ওয়েল কাম, ম্যাডাম।' বরাবরের মতো মিষ্টি হেসে কিচেনের দিকে চলে গেল রিয়া।

সাহাবুদ্দিন সাহেবের একটা অভ্যাস আছে। সকালে উঠে অনেকেই অনেক কিছুর জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করেন পেপারের। সকাল বেলা নামাজ কালাম পড়ার পর সেই যে তিনি বারান্দায় দাঁড়ান, হকার পেপার না দেওয়া পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে পেপারের সব খবর পড়েন না তিনি, বেছে বেছে ভালো খবরগুলো পড়েন। কিন্তু ইদানীং ভালো খবর পাওয়া খুবই মুশকিল হয়ে গেছে।

পেপারটা বিছিয়ে নিয়ে প্রথমে হেডিংগুলো পড়েন তিনি। হেডিং পড়ে যদি বুঝতে পারেন খবরটা খারাপ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হাতে রাখা মার্কার কলম দিয়ে খবরটা কেটে দেন। ওই কেটে দেওয়া খবর তিনি পড়বেন না। মানুষের এমনি নানা কারণে মন খারাপ থাকে, তার ওপর যদি পয়সা দিয়ে পেপার কিনে মন খারাপ করা খবর পড়তে হয় তাহলে তো খুবই মুশকিলের কথা, খুবই খারাপ ব্যাপার। কয়দিন আগে ড. ইউনুসকে নিয়ে একটা খবর ছাপা হলো, খুবই খারাপ খবর। খবরটা না ছাপলেও চলত। দেশের একমাত্র নোবেল প্রাইজ পাওয়া মানুষ, তাঁকে নিয়েও যদি খারাপ খবর ছাপা হয়, তাহলে দেশের মানুষজন কী নিয়ে বাঁচবে।

সাঁইত্রিশটা খবর মার্কার দিয়ে কাটার পর আজ একটা ভালো খবর পেলেন সাহাবুদ্দিন সাহেব। বখাটে এক ছেলেকে এলাকার কয়েকজন সচেতন ছেলে কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল শহরের মূল রাস্তার পাশে। খবরটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর কাঁচি দিয়ে কেটে ফাইল করে রাখলেন সেটা। গত কয়েক বছরে এ রকম হাজার দেড়েকের মতো খবর জমা করেছেন তিনি। আশা আছে, আগামী কয়েক বছর আরো কিছু জমা করে সবগুলো ভালো খবর নিয়ে একটা বই বের

করবেন তিনি। প্রকাশক না পেলে তিনি একাই টাকা খরচ করে বের করবেন বইটা।

পত্রিকা পড়া শেষ করে তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। নাস্তা করার সময় হয়ে গেছে এখন। তার আগে তিনটা ওষুধ খেতে হবে। হাতের পত্রিকাটা পাশে রেখে তিনি ডাক দিলেন, 'হেলেন?'

'আসছি।' কিচেন থেকে উত্তর দিলেন মিসেস হেলেন। শাড়ির আঁচলের সঙ্গে হাত মুছতে মুছতে তিনি সাহাবুদ্দিন সাহেবের সামনে এসে বললেন, 'নাস্তা রেডি।'

'ওষুধ?'

'অনেকক্ষণ আগে পানির গ্লাস আর ওষুধ রেখে গেছি পাশের টেবিলে। তুমি মনোযোগ দিয়ে পেপার পড়ছিলে বলে কিছু বলিনি।'

পাশ থেকে ওষুধ আর পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে সাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে যে অল্পবয়সী মেয়েটা এসেছে তার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার না।'

'হ্যাঁ, খোঁজ নেওয়া তো অবশ্যই দরকার। তার জন্য নাস্তাও তো রেডি করেছি আমি।' মিসেস হেলেন বেশ তৃপ্তি নিয়ে বললেন।

'তুমি করেছ মানে? আজ আমাদের বুয়া, কি যেন নাম মেয়েটার, ও হ্যাঁ অমলা আসেনি?'

'না। ওর ছেলেটার শরীর খারাপ। তাছাড়া ও আসলেও আমি আজ নিজেই নাস্তা বানাতাম। কাল পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হলো না। মেয়েটাকে খুব ভালো লেগেছে আমার। কেমন মায়া মায়া চেহারা।'

'কিছুটা আমাদের মেয়ের মতো না?'

মিসেস হেলেন কোনো কথা বললেন না। ওষুধের বক্স আর খালি পানির গ্লাসটা হাতে নিলেন। সাহাবুদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'মন খারাপ হয়ে গেল তোমার! এ বয়সে সব মেয়েকেই নিজের মেয়ে মনে হয়।' সাহাবুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো তো, মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে আসি। নাস্তা খাওয়াবে না ওকে!'

'দাঁড়াও, আরো একটু কাজ আছে, মাত্র পাঁচ মিনিট।'

কফিতে চুমক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়া বলল, 'এক কথায় শুনতে চাই—ভালো, না মন্দ?'

'অপূর্ব!' অন্তী উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দিল।

'থ্যাংকস।' বলেই রিয়া কিচেনের দিকে যাচ্ছিল। অন্তী দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার কফি?'

'হোম সার্ভিস পয়েন্টের নিয়ম হচ্ছে কোনো ক্লায়েন্টের বাসায় কোনো কিছু খাওয়া যাবে না। আপনি বোধহয় খেয়াল করেছেন আমি একটা ব্যাগ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, ওখানে আমার দুপুরের খাবার আছে।'

'আপনি কফি খাচ্ছেন এটা হোম সার্ভিস পয়েন্ট জানছে কীভাবে?'

'তবুও।'

'কিন্তু ক্লায়েন্ট যদি অনুরোধ করে?'

রিয়া কিছু বলল না। কিচেনে গিয়ে দ্রুত কফি বানিয়ে এনে অন্তীর সামনে এসে বলল, 'বাসায় আর কেউ নেই?'

'আপাতত নেই।'

'আর কেউ—।' কথাটা শেষ করতে পারল না রিয়া। তার আগেই কলিংবেলটা বেজে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল সে। সাহাবুদ্দিন সাহেব তাকে দেখে চশমাটা ঠিক করে বললেন, 'কালকে তো সম্ভবত তোমাকে দেখিনি। এখানে আর কেউ থাকে?'

রিয়া জবাব দেওয়ার আগেই কফির মগটা হাতে নিয়ে উঠে এলো অন্তী। মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'জি, থাকে।'

চশমাটায় আবার হাত দিয়ে সাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকেই তো খুঁজছি। চলো, আমার ফ্ল্যাটে চলো। আমরা আজ তিনজনে মিলে নাস্তা করব।'

'কিন্তু—।' কথাটা শেষ করতে পারল না অন্তী। মিসেস হেলেন এসে একটা হাত চেপে ধরলেন ওর, 'অনেকদিন পর নিজ হাতে নাস্তা বানিয়েছি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা। চলো।' মিসেস হেলেন রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিও চলো।'

'না, আমার জরুরী কিছু কাজ আছে।' রিয়া অন্তীর দিকে তাকাল, 'ম্যাডাম, যদি কোনো সমস্যা না থাকে আপনি যেতে পারেন।'

'যাব?' অন্তীর ইতস্তত করা দেখে মিসেস হেলেন কিছুটা জোর করেই নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন তাকে। কিন্তু ডায়নিং টেবিলের কাছে এসে ছোটখাটো একটা চিৎকার দিয়ে অন্তী বলল, 'এত নাস্তা খাবে কে?'

চেয়ারে বসতে বসতে সাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'তুমি।'

'বাসায় আর কেউ নেই!'

'কেন, আমরা আছি না।'

'এত বড় বাসায় আপনারা মাত্র দুজন!'

'আমরা তো তাও দুজন, তুমি তো একা।' সাহাবুদ্দিন সাহেব একটা প্লেট অন্তীকে দিয়ে নিজে একটা প্লেট নিয়ে বললেন, 'তোমার বাবা-মা কোথায়, তারা আসবেন না?'

'আসবেন।' অন্তী একটু থেমে বলল, 'আপনারা বড়, আপনাদের কথা শুনব আগে আপনাদের ছেলে মেয়ে—।' কথাটা শেষ না করে অন্তী তাদের দিকে তাকাল।

'আমাদের দু ছেলে এক মেয়ে। ছেলে দুটো নিউজিল্যান্ডে থাকে, মেয়ে তার হাজবেন্ডকে নিয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়ায়।'

'আপনারা তাহলে এখানে কেন?'

শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন সাহাবুদ্দিন সাহেব, 'কী দরকার অন্যের সংসারে অতিথির মতো থাকতে! জীবনে কখনো ভাবিনি ছেলেমেয়েদের ভালো করে লেখাপড়া শেখালে তারা দূরে চলে যায়।' অন্তীর প্লেটে একটা পরোটা তুলে দিয়ে তিনি বলেন, 'সকাল সকাল মন খারাপ করা কথা বলতে ভালো লাগছে না। তুমি বরং তোমার কথা বলো। শুনে আনন্দে একটু হাসি।'

হেসে ওঠে অন্তী, কোনো কথা বলে না। আপন মনে খাচ্ছে সে, খুব আনন্দ নিয়ে খাচ্ছে। থমকে গেলেন সাহাবুদ্দিন সাহেব— মানুষ যদি জানতো নিজে খাওয়ার চেয়ে অন্যকে খাওয়াতে, অন্যের খাওয়া দেখতে বেশি আনন্দের, তাহলে মানুষ না খেয়ে থাকত এই পৃথিবীতে!

কিছুটা ঝড়ের বেগে রাহাদের ঘরে ঢুকল আনিকা। জুতোর ফিতা বাঁধছিল ও। বোনকে একপলক দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আ-আপু, বলো তো আমাকে কেমন লাগছে?'

'খুবই চমৎকার।'

'কোনো অর্নামেন্ট এক্সট্রা লাগছে না তো?'

'না, একদম না।'

ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে রাহাদ বলল, 'এই যে হাতে ব্যান্ডটা পরেছি, ভালো লাগছে, আ-আপু?'

'ভালো লাগছে।'

'কিন্তু কেমন যেন মেকাপ সর্বস্ব মেয়েদের মতো লাগছে।' ঘরের দেয়াল জুড়ে লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাহাদ বলল, 'রাতে কী সব গান-টান বাজাও না তুমি, সিডিগুলো আমাকে একটু দিও তো।'

'গানগুলো তুই শুনেছিস নাকি!' খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে আনিকা বলল, 'আমি তো অনেক রাতে গানগুলো বাজাই। তখন তো তুই মরার মতো ঘুমিয়ে থাকিস। শুনলি কীভাবে?'

'কাল অনেক রাত জেগেছিলাম।'

'কেন!' কিছুটা অবাক হয়ে বলে আনিকা।

'চাঁদ দেখেছি।'

'চাঁদ দেখার জন্য রাত জেগেছিস তুই!'

'চাঁদ দেখতে অনেক সুন্দর আ-আপু। আমি কোনোদিন এত গভীরভাবে চাঁদ দেখিনি।' খাটের ওপর বোনের পাশে বসে রাহাদ বলল, 'আকাশে যে এত তারা ওঠে আমি কখনো তা খেয়াল করিনি।'

'অনেক তারা ওঠে আকাশে। আমাদের এই পৃথিবীটা যে গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত সেই গ্যালাক্সিতে তারার সংখ্যা প্রায় ২৫০ বিলিয়ন। এই এতগুলো তারার মাঝে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে গোনা যায় প্রায় ৬০০০ তারা।'

'ছোট ছোট তারার মাঝে কোনো কোনো তারা এত জ্বলজ্বল করে জ্বলে! অদ্ভুত লাগে আকাশটা।'

'সবচেয়ে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কোনটা, বল তো?'

'কোনটা, আ-আপু?'

'লুব্ধক। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ৮.৮ আলোকবর্ষ।' আনিকা হাসতে হাসতে বলল, 'রাতও দেখতে অনেক সুন্দর, জানিস?'

'জানতাম না, কাল জেনেছি। অন্ধকারের মাঝে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় অনেক কিছু স্পষ্ট দেখা যায়।' রাহাদ গলাটা নিচু করে বলল, 'পাশের বিল্ডিংয়ের মামুন ভাইয়া আর ভাবী অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে হেঁটে বেড়ায়। হাত ধরাধরি করে তাদের হাঁটাটা এত ভালো লাগছিল আমার!'

'সত্যি ভালো লাগছিল তোর?'

'খুবই ভালো লাগছিল।'

'কিন্তু কয়েকদিন আগে তুই কিন্তু আমাকে একটা কথা বলেছিলি।'

রাহাদ বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা, আ-আপু?'

'দুটো ছেলে-মেয়ে নাকি হাত ধরাধরি করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তাই দেখে খারাপ লেগেছিল তোর। তোর কাছে মনে হয়েছিল আদিখ্যেতা।' আনিকা আবার হাসতে থাকে, 'কী, বলেছিলি না?'

'বলেছিলাম। তখন কিন্তু আ-আপু খারাপই লেগেছিল। কাল কিন্তু ভালো লেগেছিল।'

'এখন থেকে তোর এসব ভালো লাগবে। ফুল ভালো লাগবে তোর, নদী ভালো লাগবে তোর, ঘাস ভালো লাগবে।' আনিকা হাসতে হাসতে বলল, 'কর্কশ স্বরে ডাকে যে কাক, সেটাও ভালো লাগবে।'

কিছুটা লজ্জা পাওয়া ভঙ্গিতে আনিকার দিকে তাকাল রাহাদ। তারপর মাথাটা নিচু করে বলল, 'মাম কি তোমাকে কিছু বলেছে, আ-আপু?'

'আমাকে কি কিছু বলার কথা?'

'ঠিক তা না।' রাহাদ কিছুটা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, 'বাবস কি তাহলে বলেছে?'

'ড্যাডের কি কিছু বলার কথা ছিল?'

'সেটাও না।'

আনিকা উঠে দাঁড়িয়ে রাহাদের একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'একটা প্লানের কথা বলেছিলাম না তোকে— আমি আর তুই মিলে একদিন অনেক দূরে বেড়াতে যাব, অনেক দূরে। সারাদিন পর আমরা বাসায় ফিরব।'

'মাম আর বাবসকে বলে যাব না?'

'একদিন বলে না গেলে কী হয়?' আনিকা একটু থেমে বলল, 'কিছু বলে যাব না, চিঠি লিখে রেখে যাব একটা। কিন্তু কোথায় যাব সেটা লিখব না। সেদিন আমাদের যা ইচ্ছে হবে তাই করব, যা মনে হয় তা-ই খাব, যা কিনতে ইচ্ছে করে তা-ই কিনব। প্লানটা কেমন বল তো?'

'খুবই ভালো।'

'তুই কি আর কাউকে সঙ্গে নিতে চাস? সমস্যা নেই, আর কেউ সঙ্গে গেলে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই।' আনিকা রাহাদের দু কাঁধে দুটো হাত রেখে বলে, 'কনগ্রাচুলেশন্স!'

রাহাদ অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

কোনো জবাব না দিয়ে আনিকা চলে গেল।

মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে আবিন চৌধুরীর। দুটো কারণে—এক. রোজা উপলক্ষে দেড় হাজার টন ছোলা মজুদ করেছিলেন তিনি, গতকাল সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন। অবশ্য তিনি নিজের বুদ্ধিতে বিক্রি করেননি, বিক্রি করেছেন তার কয়েক বিজনেস বন্ধুর কথাতে। কিন্তু তিনি যে দামে বিক্রি করেছেন আজ পেপার খুলে দেখেন ছোলার বাজার অনেক হাই, সামনের কয়েকদিনে আরো হাই হবে। গতকাল বিক্রি না করে আজকে বিক্রি করলে পোনে আট লাখ টাকা বেশি লাভ হতো, আরো কয়েকদিন পর বিক্রি করলে আরো বেশি লাভ হতো। দুই. সকাল বেলা ঘুম ভেঙেছে এক ভণ্ড রাজনীতিবিদের ফোনে। কী একটা প্রোগাম আছে, দুই লাখ টাকা চাঁদা দিতে হবে তাদের।

ডায়নিং টেবিলে বসে অপেক্ষা করছেন তিনি। সবাই মিলে আজ একসঙ্গে নাস্তা করবেন। কিন্তু মুডটাই নষ্ট হয়ে গেছে। উঠে চলে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়টাতে রাহাদ যখন ডায়নিংরুমে ঢুকল, ছেলের দিকে তাকিয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল তার। ছেলেটা যে দেখতে এত সুন্দর আগে কখনো ভালো করে খেয়াল করেননি। সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ না করার জন্য নিজেকে প্রবোধ দিলেন তিনি— এক. ছোলাতে এবার লাভ কম হয়েছে, অন্য কিছুতে বেশি লাভ করা যাবে। দুই. এদেশের রাজনীতিই হচ্ছে চাঁদা নির্ভর। এর আগেও কয়েক লক্ষ টাকা বিভিন্ন পার্টিকে চাঁদা দিয়েছেন তিনি, সুতরাং যতদিন এদেশে বেঁচে থাকবেন, ব্যবসা করবেন, নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য চাঁদা তাকে দিয়ে যেতেই হবে।

রিমিকা বসু ঘন দুধের পায়েসের বাটিটা হাতে করে রুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আজ সবগুলো খাবারই রাহাদের প্রিয় খাবার রান্না করেছি আমি। অবশ্য পায়েসটা রান্না করেছে আনিকা।'

'আ-আপু রান্না করেছে! খাওয়া যাবে তো!' কথাটা বলেই সামনে তাকিয়ে দেখে আনিকা দাঁড়িয়ে আছে, খেয়াল করেনি। আনিকা যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখতে পেলে কথাটা বলত না সে। নিজের কথার সংশোধনী এনে কিছুটা দুঃখিত হওয়ার ভঙ্গিতে রাহাদ বলল, 'স্যরি আ-আপু, অভিজ্ঞতার আলোকে কথাটা বলেছি আমি।'

আনিকা একটু এগিয়ে এসে বলল, 'কীসের অভিজ্ঞতা?'

'গরুর মাংসের কী একটা কারি রান্না করেছিলে না তুমি একদিন। মসলা দিতে দিতে এমন তেতো করে ফেলেছিলে, মুখেই দেওয়া যায়নি।'

'কত বছর আগের কথা সেটা?' বেশ গম্ভীর হয়ে বলল আনিকা।

'দু বছর তো হবেই।'

'এই দু বছরে পৃথিবীতে কত কিছু ঘটে গেছে জানিস? নতুন ধরনের এগারটা ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা ছোটখাটো একটা পরীক্ষা করে ফেলেছেন, জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে ভয়াবহভাবে, মারা গেছে প্রায় কয়েক কোটি মানুষ, পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পথে এগিয়ে গেছে আরো কয়েকটা দেশ।' আনিকা রাহাদের দিকে একটু রাগি চোখে তাকিয়ে বলে, 'আরো শুনবি?'

'এই দু বছরে তুমি তিন তিনটা রান্নার কোর্স করেছ।' রাহাদ হাসতে হাসতে বলল, 'শেষপর্যন্ত তুমি এটাই বলবে তো?'

'হ্যাঁ, শেষপর্যন্ত আমি সেটাই বলতাম।'

'এবং প্রতিদিন একেকটা রান্না শিখে এসে তুমি বাসায় এসে তা রান্না করতে। আর সেই রান্নাটা খাদ্য হোক আর অখাদ্য হোক প্রথমে খেতে হতো আমাকেই।' রাহাদ আনিকার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মানব সভ্যতা কীভাবে এগিয়েছে জানো?'

আনিকা খুব শান্ত গলায় বলল, 'কীভাবে?'

'নিরীহ প্রাণীদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে।'

'যেমন?'

'এই যে পৃথিবীতে এত ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে সেটা প্রথম কাকে খাওয়ানো হচ্ছে? নিশ্চয় কোনো বানর ধরনের প্রাণীকে কিংবা কোনো যাবজ্জীবন সাজা হওয়া কয়েদীকে। এই যে বাচ্চাদের জন্য চোখে জ্বালা না ধরা বিভিন্ন শ্যাম্পু আবিষ্কার হয়েছে, সেটা প্রথমে কার চোখে লাগিয়ে টেস্ট

করা হয়েছে? ওই বানর শ্রেণীর প্রাণীর ওপর। আবার এই যে নতুন নতুন বোমা আবিষ্কার হচ্ছে সেগুলো কিন্তু সমুদ্রে ফেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে, হাজার হাজার সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে তাতে।'

'তার মানে তুই হচ্ছিস নিরীহ একটা প্রাণী, নতুন নতুন খাবার রান্না করে তোর ওপর এক্সপেরিমেন্ট করি আমি?'

'সেটা তো অন্যায় কিছু না আ-আপু।' রাহাদ আবার হাসতে হাসতে বলে, 'ওই যে বললাম না, মানব সভ্যতা এগিয়েছেই তো এভাবে, আর তুমি না হয় আমার ওপর রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করেছ বা করছ, এতে তো তোমার রান্নার হাত পাকা হচ্ছে। এই হাত নিয়ে তুমি রান্না করবে আর আমরা সবাই মজা করে খাব।' রাহাদ মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'মাম, পায়েস দাও তো আমাকে, দেখি আ-আপু কতটুকু এক্সপার্ট হলো!'

'তার আগে আমি একটা কথা বলি।' আবিন চৌধুরী রিমিকা বসুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাহাদকে আজ এত সুন্দর লাগছে কেন বলো তো?'

'আজ সুন্দর লাগছে মানে! ও কি আগে অসুন্দর ছিল?'

'না, আগে ওভাবে দেখা হয়নি তো?'

'না দেখারই কথা। তুমি তো তাকিয়ে থাকো তোমার ওই ছোলা, ছোলার ডাল, চিনি, সয়াবিন, টেন্ডার-মেন্ডারের দিকে।'

'আমি কি অন্য কিছুর দিকে তাকাই না!'

'তাকাও, তবে ওগুলোর দিকে তাকানোর পর যদি সামান্য সময় পাও তাহলে তাকাও।' অভিমানী স্বরে বললেন রিমিকা বসু।

'কিন্তু এসব আমি কাদের জন্য করছি। আমার জন্য? পৃথিবী যদি আরো পাঁচ হাজার কোটি বছর বেঁচে থাকে আমার যা আছে আমি তা খেয়ে, বিভিন্নরকম ভোগ করে শেষ করতে পারব না।'

'ড্যাড, কাজটা কি তাহলে অন্যায় হয়নি। কত মানুষ না খেয়ে আছে, আর আমাদের কত খাবার!' রাহাদ বাবার দিকে তাকিয়ে বলল।

'এই যে তুমি কথাটা বললে এটা তখনই বলা সম্ভব যখন তোমার পেটে খাবার থাকবে, তোমার চাহিদা পরিপূর্ণভাবে পূরণ হবে।' আবিন চৌধুরী কিছুটা রূঢ় স্বরে বললেন, 'পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে নীতিকথা বলেছেন তুমি তাদের সম্বন্ধে ভালো করে জেনে নিও, তারা নিজেরাই সেই নীতিকথা মানেননি, বরং উল্টো কাজ করেছেন।' মেজাজটা আবার খারাপ হয়ে গেল আবিন চৌধুরীর। ডায়নিং টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। রিমিকা বসু রাগী স্বরে বললেন, 'উঠছো কেন তুমি!'

'ভালো লাগছে না।'

মন খারাপ হয়ে গেল রাহাদেরও। মায়ের দিকে তাকিয়ে মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল। চোখ ছলছল করে তাকিয়ে আছেন তিনি তার দিকে। এ মুহূর্তে কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছেন না।

ডায়নিং টেবিলের কাছে চলে এলো আনিকা। বাবার প্লেটটা বাবার প্রিয় খাবার দিয়ে সাজিয়ে রাহাদের হাতে দিয়ে ইশারা করল। প্লেটটা হাতে নিয়ে রাহাদ বাবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'বাপস, আসব?'

মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আবিন চৌধুরী। ছোট্ট করে বললেন, 'আসো।'

বাবার একেবারে সামনে গিয়ে প্লেটটা মেলে ধরে রাহাদ বলল, 'স্যরি বাবস, আই অ্যাম এক্সট্রেমলি স্যরি।'

মোবাইলটা পাশে রেখে আবিন চৌধুরী হেসে ফেললেন। ছেলের হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম অলসো স্যরি। ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনটা ভালো ছিল না। তা, তুমি কি কোথাও যাচ্ছো?'

'জি, বাবস।'

'কোথায় যাচ্ছো?' আবিন চৌধুরী একটু হেসে বললেন, 'থাক বলতে হবে না। আমি আজ বাইরে যাচ্ছি না, তুমি আজ আমার নতুন গাড়িটা নিয়ে যেও, যতক্ষণ খুশি সময়টা এনজয় করো। আর এই টাকাগুলো রাখো— ।' এক হাজার টাকার অনেকগুলো নোট ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'ইচ্ছেমতো খরচ করো।'

'থ্যাংকস বাবস।'

ছেলের একটা হাত নিয়ে নিজের বুকের সঙ্গে ঠেকালেন আবিন চৌধুরী। বুকের ভেতরটা আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি খুব শান্ত গলায় বললেন, 'জীবনটা অনেক সুন্দর, না?'

'ছোটও।' কেমন যেন কেঁপে ওঠে রাহাদের গলাটা।

ডান পাশের মোড়ে শব্দ হলো, ঝট করে সেদিকে ঘুরে দাঁড়াল রাহাদ। একটা গাড়ি এসে থামল রাস্তার পাশে। দরজাটা খুলে গেল। একজোড়া পা নামার পর সম্পূর্ণ মানুষটা যখন নেমে এলো, কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল সে। কেউ কোনো কথা বলছে না, কিন্তু হাসছে, দুজনই। তাদের চোখ হাসছে, শরীর হাসছে, মনও হাসছে। আরো কিছুক্ষণ পর গভীরভাবে কেবল নিঃশ্বাস ছাড়ল দুজন। তারপর আবার চুপচাপ।

মুগ্ধ চোখে অন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল রাহাদ। সদ্য আঠার পেরিয়ে উনিশ, নতুন কচি পাতার মতো মসৃণ, বাঁকানো ভ্রুর নিচে চঞ্চল দুটো চোখ আর বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা অবিন্যস্ত চুল— পৌরাণিক কোনো দেবী, অনন্তকাল দেখলেও অতৃপ্ত রয়ে যায় মন।

পা ফেলে নয়, যেন ডানায় দোল লাগিয়ে এগিয়ে এলো অন্তী। মুগ্ধ করা হাসিতে ভরা মুখখানা, এখনো; দোলনচাঁপার গন্ধে ভেসে গেল বাতাস, হঠাৎ একগুচ্ছ চুলের স্পর্শ— বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল রাহাদের, দুলে উঠল সমস্ত অস্তিত্ব। বাতাসে ফিসফিস করে কে যেন বলছে, এই তো, এই তো এখানেই শ্যামল ছায়া। এই তো, এখানেই মিশে আছে ভালোবাসার শ্বাস। এখানেই হৃদয়ের সব চাওয়া-পাওয়া।

টুংটাং করে উচ্ছল অন্তী বলে উঠল, 'কখন এসেছ?'

'এই তো।' ঘোর কাটানো গলায় রাহাদ বলল, 'খুব বেশি আগে না, পনের-বিশ মিনিট আগে।'

ঘড়ির দিকে তাকাল অন্তী, 'স্যরি, দেরি করে ফেললাম। যা জ্যাম ছিল। তাছাড়া কোনো ক্যাব-ট্যাবও পাওয়া যাচ্ছিল না।'

'নো প্রবলেম। এরপর থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেব।' রাহাদ চোখ দুটো নাচিয়ে বলল, 'আজ কিন্তু রাতের আগে বাসায় ফেরা হবে না।'

'রাত মানে কয়েক ঘণ্টা!' ঠোঁটের কোণে এক টুকরো দুষ্টু হাসি অন্তীর, 'এতক্ষণ আমরা কী করব?'

'যা ইচ্ছে তা-ই করব।' রাহাদ কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'দূরে কোথাও গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি আমরা অনেকক্ষণ।'

'তা পারি। কারণ নির্জনতায় ভালোবাসার আবাস।'

'কিংবা হাঁটতে পারি আমরা ক্লান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত।'

'ভালোবাসার হাঁটায় কোনো ক্লান্তি নেই, তাড়া নেই।' গভীর চোখে রাহাদের দিকে তাকিয়ে অন্তী বলল, 'বরং তৃপ্তি আছে। পথ পেরুনোর তৃপ্তি, পথের মানুষ দেখার তৃপ্তি।'

'আমরা অবশ্য কোনো নদীর ধারে বসে নদীর পানিও দেখতে পারি।'

'পানিতে নিজের ছায়া দেখা যায়। সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখা যায়। ঘুম ভাঙার পর ঘুমানো পর্যন্ত মানুষ নিজেকে দেখে কম, অন্যকে দেখতে দেখতে নিজেকে ভুলে যায়।'

'জানো—।' রাহাদ অন্তীর একটা হাত ধরতে নেয়, কিন্তু মাঝপথে এসে থেমে যায় হাতটা। অন্তী মুচকি হাসে, নিজেই এবার হাত বাড়িয়ে দেয়। কিছুটা কাঁপা হাতে হাতটা ধরে রাহাদ বলল, 'আমাদের দাদুবাড়ি কিন্তু গ্রামে। অনেক বড় তিনটা পুকুর আছে দাদুদের। গোসল করতে ছিলাম একদিন, কিন্তু হঠাৎ করে ডুবে গিয়েছিলাম সেদিন। ভাগ্যিস, দাদুর বাড়ির কিছু কাজের মানুষ বসেছিল পুকুরের পাশে।'

'না বসে থাকলে কী হতো!' অন্তী গলাটা বিষাদ করে বলল, 'কতটুকু ভাগ্য নিয়ে আসলে তোমার মতো একটা ছেলের ভালোবাসা পাওয়া যায়?'

লজ্জা পায় রাহাদ। মাথা নিচু করে ফেলে সে। কিছুটা মিনমিনিয়ে বলে, 'ভালোবাসার ব্যাপারটা আমার কাছে চিরকালই অন্যরকম মনে হয়েছে— কিছুটা আড়ালের, কিছুটা গভীরতার, কিছুটা সম্মানের, তবে পরিপূর্ণ হৃদয়ের। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবীই এ জিনিসটা নার্সিং করে, কিন্তু আমার কখনো ইনভলব হতে ইচ্ছে করেনি। সবাই আমার কাছে এত ভালোবাসা পেতে চেয়েছে কিন্তু আমার ওটা দিতে ইচ্ছে করেনি কাউকেই। ওটা তো চাওয়ার ব্যাপার না, অনুভবের। অনুভূতিই বলে দেবে— ওই মানুষটাকে আমি ভালোবাসি কিংবা ওই মানুষটা আমাকে ভালোবাসে।'

আলতো করে অন্তী রাহাদের চিবুকটা ছুঁয়ে বলল, 'একদম ঠিক কথা। মন বলে দেবে— কোথায় আমার মন বসেছে, হৃদয় ভাববে— কোন হৃদয়ে আমার আবাস। ভালোবাসাবাসি হলে পৃথিবীর সব কিছুকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ভালোবাসায় ডুবে যেতে।'

'আচ্ছা, আমরা দাঁড়িয়ে আছি কেন?'

'প্রশ্নটা তো আমারও।'

রাহাদ অন্তীর হাতটা চেপে ধরে বলল, 'গাড়িটা ওই ফাঁকা জায়গায় রেখেছি। চলো।'

গাড়ির কাছে এসে অন্তী বলল, 'ড্রাইভার কই? গাড়ি চালাবে কে?'

'কেন, ড্রাইভার বলে মনে হয় না আমাকে?'

'ড্রাইভারদের যদিও দু হাত দু পা থাকে, কিন্তু তোমাকে তো ড্রাইভারদের মতো মনে হয় না।'

'কিন্তু আজ আমিই ড্রাইভার।' গাড়ির দরজাটা খুলতে খুলতে রাহাদ বলল, 'কেন বিশ্বাস হচ্ছে না? ভয় করছে?'

'এত বড় গাড়ি! তুমি চালাবে!'

'আমি কি ছোট! আঠার বছর হলে ভোট দেওয়ার অধিকার হয় সবার, আমার একুশ। পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি, ওজন সিক্সটি সিক্স, চেস্ট থার্টি নাইন, আর কিছু?'

দু চোখ মেলে রাহাদের দিকে তাকাল অন্তী, কিন্তু কিছু বলল না। গাড়িতে উঠে বসল। রাহাদ গাড়িটা স্টার্ট দিতেই বাঁ পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঢাকা শহরের আশপাশে এখনো অনেক জায়গা খালি, অনেক জায়গায় পানি আর সবুজ— গ্রামের মতো। আবেশে চোখ বুজে ফেলে অন্তী। সবুজ গ্রাম, পাশ দিয়ে বয়ে চলা টলটলে নদী। বাবা একদিন সবুজ ঘাসের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'মা, খালি পা হও তো?'

তার বয়স তখন ছয়। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বাবা?

বাবা নিজের জুতো খুলতে খুলতে বলেন, খালি পায়ে আজ আমরা এই ঘাসের ওপর হাঁটব।

খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটলে কী হয়, বাবা?

তা তো জানি না, মা।

বাবা হাঁটছেন, মেয়েও হাঁটছে। অনেকক্ষণ হাঁটার পর বাবা বললেন, মনটা কেমন যেন এখন শান্ত লাগছে।

বাবা একদিন এরকম সবুজ ঘাসের ওপর চোখ বুজে শুয়েছিলেন। সেই চোখ কোনোদিন খোলেননি। মানুষজন বিলাপ করে কাঁদছিল, মা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল বারবার। কত মানুষ সেদিন বাড়িতে এসেছিল!

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে অন্তী— খালি পায়ে ঘাসে হাঁটলে মন শান্ত হয়! বাবার মুখটা ভেসে উঠছে বারবার।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো রাহাদ, 'এভাবে কি চুপ করে থাকার কথা ছিল?'

চোখ দুটো মুছে কিছুটা বাষ্পরুদ্ধ গলায় অন্তী বলল, 'না, ছিল না।'

ঝট করে অন্তীর দিকে ঘুরে তাকাল রাহাদ। গাড়ির গতিটা একটু থেমে গেল এবং এক সময় থেমে গেল সেটা রাস্তার পাশে। দু হাত দিয়ে অন্তীর মুখটা চেপে ধরে অস্থির হয়ে বলল, 'কী হয়েছে, তোমার?'

'কিছু না।' বলে হাসার চেষ্টা করল অন্তী, কিন্তু চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তার, টপটপ করে পড়ছে।

লুসির অভ্যাসটা বাজে না ভালো সেটা নিয়ে ওদের বন্ধুদের কেউ কখনো চিন্তা করেনি। ওর অভ্যাসটা হচ্ছে তুচ্ছ যেকোনো কারণেই দীর্ঘমেয়াদী একটা হাসি দেওয়া এবং নিঃশ্বাসজনিত কারণে একটু বিরতি দিয়ে আবার হাসতে শুরু করা। লুসি এখনো হাসছে। ওর হাসির কারণটা হচ্ছে রাহাদকে নিয়ে মজার একটা কথা বলেছে শ্রানতু। শ্রানতুর সব কথাতেই অবশ্য মজা লাগে, কিন্তু রাহাদকে নিয়ে যা বলেছে সেটা আরো মজার। যদিও কথাটা রাহাদের জন্য অপমানজনক, কিন্তু রাহাদ শুনলে কোনোরকম আপমানিত হওয়া দূরের কথা, সামান্যরকম মাইন্ডও করবে না। কিন্তু মাইন্ড করল মোনা। কিছুটা ঝগড়াটে গলায় ও বলল, 'কথাটা রাহাদের সামনে বললে ভালো হতো, কিন্তু ওর অনুপস্থিতিতে বলাটা মোটেই উচিত হয়নি।'

শ্রানতু হাসতে হাসতে বলল, 'এত সিরিয়াসভাবে নিচ্ছিস কেন ব্যাপারটা! হালকাভাবে নে, দেখবি ব্যাপারটা আসলেই হালকা।'

'একটা ব্যাপার কিন্তু এতে স্পষ্ট হয়ে যায়।' মোনা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমাদের মধ্যে এখানে যে অনুপস্থিত থাকবে তাকে নিয়েই ওরকম দু-একটা কথা বলা হবে।'

'অবজেকশন।' শ্রানতু এবার সিরিয়াস হয়ে বলল, 'এর আগে তুই তিনদিন আমাদের আড্ডায় আসিসনি, কান্তা কয়েকদিন আসেনি, রাহুল আসেনি। কই তোকে কিংবা ওদেরকে নিয়ে কিন্তু কথা বলা হয়নি। রাহাদকে নিয়ে কথাটা বলার কারণ হচ্ছে— সকাল থেকে শালার মোবাইলটা বন্ধ। তুই শালা, এমনকি ব্যস্ত যে মোবাইল বন্ধ রাখতে হবে তোর!'

'কোনো সমস্যা তো থাকতে পারে ওর।'

'সমস্যা তো আমাদেরও হয়। কই, আমরা কি তখন মোবাইলটা বন্ধ রাখি।' শ্রানতু আবার হেসে ফেলে বলল, 'আমরা সবাই বোধহয় রাহাদকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। ওর বাপের যে ভূরিভূরি টাকা আছে এ জন্য কিন্তু পছন্দ করি না। টাকা থাকলেই যদি পছন্দনীয় ব্যক্তি হওয়া যেত তাহলে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম আমরা পল্লবকে। কারণ ওর বাপের সবচেয়ে

বেশি টাকা। কই আমরা পল্লবকে তো পছন্দ করি না। ও আমাদের সঙ্গে অনেকবার মিশতে চেয়েছে, ওকে মেশার সুযোগও দেইনি আমরা।'

কান্তা হচ্ছে ওদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যার চোখে ইয়া মোটা কাচের একটা চশমা আছে। চশমটাতে এত পাওয়ার যে ওটা রোদে মেলে তার নিচে একটা কাগজ রাখলেই আধা মিনিটের মধ্যে আগুন ধরে যায় তাতে। ও এই মোটা চশমা পড়ে দিব্যি বই পড়ে যায়, এমনকি তুমুল আড্ডাতেও এই বই পড়ার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না ওর। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, এত মনোযোগ দিয়ে বই পড়ার পরও আড্ডার সব কথা ও খুব স্পষ্টভাবে শোনে এবং রেসপন্সও করে পরিষ্কারভাবে। বইটা পাশে রেখে কান্তা বলল, 'আমি একটা কথা বলব?'

'তোকে তো কেউ মানা করেনি।' রাহুল বলল।

রাহুল আর কান্তার কথা শুনে মনে হবে ওরা হচ্ছে একে অপরের জাত শত্রু। কিন্তু দুজনের প্রতি দুজনের যে টান সেটাও চোখে পড়ার মতো। একবার সবাই একটা হোটেলে খেতে গিয়েছিল। রাহুল কী একটা কাজে আটকে গিয়েছিল, আসতে একটু দেরি হবে। সবাই খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু কান্তা চুপ করে বসেছিল। রাহুল না আসা পর্যন্ত কোনো কিছু মুখে দেয়নি সে।

হাতের বইটা দিয়ে রাহুলের মাথায় একটা আঘাত করে কান্তা বলল, 'চল না, সবাই মিলে রাহাদদের বাসায় যাই।'

'এই দুপুর বেলা!' রাহুল মুখ বাঁকা করে বলল।

'দুপুর হয়েছে তো কী হয়েছে! আমরা ওদের বাসায় খেতে যাচ্ছি নাকি! রাহাদ থাকুক অথবা না থাকুক ওর খোঁজটা নিয়েই চলে আসব।'

'আর যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে কবরটা দিয়ে আসব।' শ্রানতু হাসতে হাসতে বলল, 'ওঠ, কান্তার প্রস্তাবটা মন্দ না।'

'কিন্তু রাহাদদের বাসা তো সেই উত্তরায়!' রাহুল অনিচ্ছার ভঙ্গিতে বলে সবার দিকে তাকাল।

'মানুষ তো আর উত্তরায় যায় না!' কান্তা মেজাজটা গরম করে বলল, 'মানুষ গাজীপুর থেকে এসে ক্লাস করে। আমরা কেউ তো বোধহয় গাড়ি নিয়ে আসিনি আজ। আমি আব্বুকে ফোন করে দিচ্ছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ি এসে যাবে।'

'তোদের গাড়িতে যাব উত্তরায়! যেতে যেতে রাস্তার ভেতর কমপক্ষে একশবার বন্ধ হয়ে যাবে!'

'বন্ধ হয়ে গেলে সমস্যা কী, তুই ঠেলে আবার স্টার্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করবি।' কান্তা মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল, 'সবাইকে তো আর গাড়ি ঠেলা মানায় না, তোকে মানায়, সদরঘাটের কুলির মতো মানায়।'

রাহাদদের বাসার দিকে তাকিয়ে শ্রানতু বলল, 'আচ্ছা বল তো, স্বর্গে যে আমরা একেকটা বাড়ি পাব সেটা কি এর চেয়েও সুন্দর হবে?'

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে একটু চিন্তা করে রাহুল বলল, 'কাছাকাছি হবে।'

'এটা একটা সুন্দর বাড়ি হলো নাকি!' কান্তা ওর মোটা চশমাটা একটু উপরে তুলে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঢাকা শহরে এর চেয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে।'

'কান্তা, তোদের বাড়িটাও তো সুন্দর।' মোনা মিটিমিটি হেসে বলল, 'মাসে কত টাকা বেতন পেলে এরকম বাড়ি বানানো যায়, বল তো?'

'চাকরি করে আর এসব বাড়ি করার কথা ভেবো না বন্ধু। এরজন্য তোমাকে হতে হবে ব্যবসায়ী।' লুসি চোখ টিপে বলল, 'আর চাকরি করতে হলে করতে হবে সেই সব চাকরি, বেতনে যা পাওয়া যাবে তার চেয়ে কয়েকগুণ টাকা আসবে অন্য জায়গা থেকে।'

'আমার একটা প্রস্তাব আছে।' শ্রানতু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জীবনে তো বোধহয় এরকম বাড়ি কখনো করতে পারব না। একদিন সবাই মিলে রাহাদ শালার সঙ্গে কাটালে কেমন হয়?'

কান্তা বেশ ব্যথিত গলায় বলল, 'এ ধরনের বাড়িতে খুব থাকতে ইচ্ছে করছে তোর?'

'শুধু থাকতে ইচ্ছে করছে, এরকম বাড়িওয়ালার কোনো মেয়ে পেলে বিয়েটাও সেরে ফেলতাম। রাজত্ব আর রাজকন্যা— ভাবতেই মাথা ঘুরে ওঠে রে।' শ্রানতু মাথার চুলগুলো টানতে টানতে বলল।

রাহাদদের বাড়ির দারোয়ান কুষ্টিয়ার মানুষ। খুব শুদ্ধ করে কথা বলে সে। ওদেরকে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'আসসালামু ওলাইকুম। আপনারা এসেছেন, কিন্তু রাহাদ ভাইয়া তো নেই?'

'কোথায় গেছে, নেহাল ভাই।' শ্রানতু জিজ্ঞেস করল।

'তা তো বলতে পারব না। তবে আজ বড় সাহেবের গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন। সকালেই বের হয়েছেন।'

'একা?' মোনা জিজ্ঞেস করল।

'একাই তো যেতে দেখলাম।'

ইন্টারকমের টেলিফোনটা বেজে উঠল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে সালাম দিয়ে নেহাল বলল, 'জি আপা?'

রাহাদদের বাসার গেটে একটা ক্যামেরা লাগানো আছে। ড্রইংরুমে রাখা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আনিকা বলল, 'রাহুলরা এসেছে না, বাসার ভেতর পাঠিয়ে দাও ওদের।'

চল্লিশ মিনিট পর অন্তী হঠাৎ বাঁ পাশের জানালার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'রাহাদ, গাড়িটা থামাও তো।'

গাড়িটা বেশ জোরেই চলছিল। রাহাদ একটু এগিয়ে গাড়ি থামাল। অন্তী হঠাৎ ওর একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'একটা অনুরোধ করব তোমাকে?

অবাক হলো রাহাদ, 'অনুরোধ তো করবেই, কিন্তু এভাবে বলছো কেন তুমি? কাতর মুখ দেখতে আমার কখনো ভালো লাগে না, অন্তী।'

'স্যরি।' অন্তী একটু উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখো, চাদরের মতো বিছানো সবুজ ঘাস, খালি পায়ে আমি একটু হাঁটব।'

'অবশ্যই। তুমি যাও।'

'তুমিও আসো না!' গভীর দুটো চোখ ছলছল হয়ে গেছে অন্তীর।

ইতস্ততটা এসে গিয়েছিল, কিন্তু ঝট করে মন থেকে সেটা সরিয়ে ফেলল রাহাদ। জুতো আর মুজো জোড়া খুলে নেমে পড়ল সে গাড়ি থেকে।

দেড়শ ফিট রাস্তা দিয়ে শত শত গাড়ি এপাশ ওপাশ দিয়ে শা শা করে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ হেঁটেও যাচ্ছে ফুটপাত দিয়ে। এপাশে তাদের অনেকেই দেখল, রাস্তার পাশে দামি একটা গাড়ি থামিয়ে একজোড়া তরুণ-তরুণী খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটছে, খুব আনন্দ নিয়ে হাঁটছে।

অন্তী অনুভব করল, তার মনটা শান্ত হয়ে যাচ্ছে, সত্যি সত্যি। রাহাদের বাম হাতের বাহুটা চেপে ধরে চোখ দুটো বুজে ফেলল আবেশে। অন্ধ মেয়ের মতো সে এখন হাঁটছে, অবিকল এক অন্ধ মেয়ে!

রাতে সাধারণত কোনো খাবার খান না আবিন চৌধুরী। যদি কোনোদিন কোনো কিছু খান তবে পুরো একটা পেঁপে সিদ্ধ খান তিনি। পেঁপেটা সিদ্ধ করার পর ছিলে তার গায়ে হালকা কিছু গুঁড়ো মসলা ছিটিয়ে দিয়ে খেতে হয় এটা। মসলাগুলো চীন থেকে এনেছেন, হারবাল জাতীয় মসলা। গত তিন বছর ধরে এভাবে খাচ্ছেন তিনি। বাইপাস করার পর ডাক্তার রাতের খাবারের ওপর কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, কোনো এক অভিমানে তিনি প্রায় সব খাবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, শুধু সিদ্ধ একটা পেঁপে ছাড়া। তবে আজ তিনি ভালো-মন্দ কিছু খাবেন। কারণ গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি আজ, আর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে বসে পরামর্শ করবেন তিনি।

দশ-বারো মিনিট ধরে খাবার টেবিলে অপেক্ষা করছেন তিনি। পাশে রিমিকা বসু, আনিকাও আছে, কিন্তু রাহাদ নেই। মোবাইলে কথা বলছে রাহাদ। তিন মাস আগে হলে রেগে একবারে আগুন হয়ে যেতেন আবিন চৌধুরী। খেতে বসে তিনি একেবারেই অপেক্ষা করতে পারেন না কারো জন্য, সে তিনি বড় সম্মানীয় ব্যক্তিই হোক না কেন খাবার টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে খাবার মুখে দেওয়া চাই তার। কিন্তু তিন মাস আগে বাইপাস করার পর ডাক্তারের নির্দেশে রাগ করা তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। তাছাড়া ইদানীং রাহাদ যা করতে চায় তাই করতে দেন, কোনো কিছুতেই বাধা দেন না তিনি তাকে।

ডায়নিং টেবিলের পাশে রাখা মোবাইলটা আবার বেজে উঠল আবিন চৌধুরীর। এ নিয়ে প্রায় দশবারের মতো বাজল। হাতে নিয়ে স্ক্রিনে নামটা দেখে আবার রেখে দিলেন টেবিলে। দৈনিক পত্রিকার একটা সাপ্লিমেন্ট পড়ছিল আনিকা। বাবাকে বারবার একই কাজ করতে দেখে কিছুটা বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'ড্যাড, ফোনটা ধরছ না কেন?'

'না, ধরব না।'

'তাহলে বন্ধ করে দাও।'

'বন্ধও করব না।'

'বারবার ফোনটা বাজছে, স্ক্রিনে নাম দেখে তুমি আবার সেটা রেখে দিচ্ছো, ব্যাপারটা কেমন বিরক্তিকর না!' আনিকা বিরক্তি নিয়ে বলল।

'অবশ্যই বিরক্তিকর। আমি নিজেও খুব বিরক্ত হচ্ছি, তবে তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হচ্ছে যে ক্লাউনটা আমাকে ফোন করছে।' আবিন চৌধুরী আনিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি খেয়াল করেছ ক্লাউনটা কত বড় আহাম্মক, বিশ মিনিটের মধ্যে প্রায় দশ বার ফোন দিয়েছে সে। কোনো ভদ্রলোক এ ধরনের কাজ কখনো করেন না। একবার কী দু বার কল দেন, রিসিভ না হলে ওপাশের ফোনের অপেক্ষা করেন তারা। তারা জানেনই, প্রতিটা ভদ্রলোক মিসড কল পেলেই কলব্যাক করেন।'

'কিন্তু তুমি ফোন ধরছ না কেন?'

'ফোন না ধরার কারণ হচ্ছে, ওই ক্লাউনটাকে বিরক্ত করা। যদিও আমরাও বিরক্ত হচ্ছি, তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হচ্ছে ওই ক্লাউনটা। প্রেশার আছে ওর, বিরক্ত হতে হতে একসময় ওর প্রেশার উঠে যেতে পারে। আসল কারণটা হচ্ছে— আজ সকালে ওই ক্লাউনটাকে দুই লাখ টাকা দিয়েছি আমি, চেয়েও ছিল দুই লাখ টাকা। বিকেলে ফোন করে বলে আরো দুই লাখ টাকা লাগবে। ক্লাউনটার টাকা চাওয়া দেখে মনে হচ্ছে আমি হচ্ছি টাকার গাছ, ঝাঁকি দিলেই ঝুরঝুর করে টাকা পড়ে।'

'টাকাটা ওনাকে দিয়েছ কেন তুমি?'

'বড় কোনো ব্যবসায়ী এ দেশের রাজনীতিবিদ কিংবা পার্টিকে টাকা না দিয়ে টিকে থাকবে, সেটা কখনো সম্ভব না, মা। এদেশের অনেক কিছুই চলে চাঁদা, কমিশন আর কম্প্রোমাইজের ওপর।'

'তোমরাই তো টাকা দিয়ে দিয়ে অভ্যাস করে ফেলেছ তাদের।'

'এটা অবশ্য একটা সত্য কথা। তবে অনেক আগে থেকেই এটা চলে আসছে তো তাই থামানো যাচ্ছে না।'

'থামানো যেহেতু যাচ্ছে না তাহলে দিয়ে দাও।'

'দিতে তো হবেই। তার আগে একটু টেনশনে রাখি ক্লাউনটাকে।' আবিন চৌধুরী মুখটা বিরক্ত করে বলেন, 'অনেক মানুষ দেখেছি আমি, কিন্তু এ ধরনের বিরক্তিকর আর জঘন্য মানুষ আমি কখনো দেখিনি। একবার

হয়েছে কি শোনো, টেলিভিশনের মাদকবিরোধী একটা টক শোতে অংশগ্রহণ করেছি আমরা।'

'আমরা মানে কি ড্যাড, তোমার সঙ্গে তোমার ওই ক্লাউনটাও ছিল?' আনিকা একটু সোজা হয়ে বসে বলে।

'হ্যাঁ। টক শোতে মাদকের ভয়াবহতা নিয়ে কথা বলতে বলতে ক্লাউনটা শব্দ করে কেঁদে উঠল। দেশের যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দেশে কোনো আদর্শ নাগরিক গড়ে উঠছে না, এ দেশটার কী হবে— বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। অথচ টক শো শেষে হোটেলে গিয়ে গলা পর্যন্ত নেশা করেছে সে। তারপর থেকে ওকে দেখলেই আমার ক্লাউন মনে হয়।'

আবার বেজে উঠল মোবাইলটা। আনিকা দ্রুত মোবাইলটা হাতে নিয়ে বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ড্যাড, ধরো তো। সত্যি সত্যি বিরক্ত লাগছে এখন।'

মোবাইলটা হাতে নিলেন আবিন চৌধুরী, কিন্তু রিসিভ করলেন না। বাজতে বাজতে থেমে গেল সেটা আবার। কিছুটা ভিলেনীয় হাসি দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি তো প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকি। আর ওই ক্লাউনটা এগারটার পরপরই ঘুমিয়ে যায়। আমি ঘুমানোর আগে কলব্যাক করব ওকে।'

'বিরক্ত হবেন না তিনি তখন!'

'টাকার গন্ধ পেলে কাউকে কখনো বিরক্ত হতে দেখেছ, মা।' আবিন চৌধুরী আবার হাসতে থাকেন, 'তাছাড়া আমি কলব্যাক করেই বলব, স্যরি, খান ভাই। বাইরে ছিলাম এতক্ষণ, কিন্তু মোবাইলটা ফেলে রেখে গিয়েছিলাম বাসায়। স্যরি, খান ভাই।'

রিমিকা বসু চুপচাপ এতক্ষণ বাবা-মেয়ের কথা শুনছিলেন আর পাক্ষিক একটা পত্রিকা পড়ছিলেন। পত্রিকাটা পাশে রেখে তিনি বললেন, 'মানুষ সুযোগ পেলেই মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু মোবাইলে আরো বেশি বলে। অতো রাত করে ফোন করার দরকার নেই। তুমিই কলব্যাক করো, এখনই।'

'আমি কলব্যাক করব!' আবিন চৌধুরী হাতের মোবাইলটা টেবিলে রেখে বললেন, 'প্রয়োজন ওনার, উনিই করবেন।'

'খান ভাইকেও কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের প্রয়োজন পড়ে। দুই বছর আগে ট্যাক্স নিয়ে কী একটা ঝামেলায় পড়লে, উনিই কিন্তু তোমাকে উদ্ধার করেছেন। গত বছর—।' রিমিকা বসুকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে

দিলেন আবিন চৌধুরী। স্ত্রীর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমরা ব্যবসায়ীরা বাড়িতে ছাগল পোষার মতো ওনাদের পুষি, নাকি! আমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্যই যখন তখন ওনাদের চাহিদা মিটাই আমরা, বলতে পারো ওনারা হচ্ছেন আমাদের পার্মানেন্ট কেয়ারটেকার।'

'পার্মানেন্ট কেয়ারটেকারই যদি হবে তাহলে তাদের সঙ্গে ওভাবেই আচরণ করা উচিত।'

'তাই তো করি। যখন তখন টাকা চায় তারা, চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেই-ও। এর চেয়ে আর ভালো আচরণ কী হতে পারে!'

মোবাইলটা আবার বেজে উঠতেই কী মনে এবার রিসিভ করলেন আবিন চৌধুরী, 'স্যরি, খান ভাই। সম্ভবত আপনি অনেকবার ফোন করেছিলেন। কী লজ্জার কথা! ফোনটা বাসায় ফেলে রেখে গাধার মতো আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ...না না বাসায় কেউ ছিল না। একটা বিয়ের পার্টিতে গিয়েছিলাম সবাই। ...জি, খান ভাই? ...না না, কোনো অসুবিধা নেই। টাকাটা আপনি পেয়ে যাবেন। ...খান ভাই, কী যে বলেন না আপনি! আপনাদের জন্য আমরা, আমাদের জন্য আপনারা, এভাবেই তো সবকিছু চলছে খান ভাই। ...ওকে খান ভাই, টাকাটা তাহলে সকালেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ...জি, দশটার ভেতরেই। স্লামালাইকুম।'

চোখ দুটো বড় বড় করে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে আনিকা। তাই দেখে আবিন চৌধুরী বললেন, 'কী দেখছো মা ওভাবে?'

'তোমার চমৎকার অভিনয় দেখলাম, ড্যাড।'

'বেঁচে থাকতে হলে মাঝে মাঝে এভাবে অভিনয় করতে হয়, মা।'

আনিকা গভীর চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ড্যাড, রাহাদের সঙ্গে আমরা যা করছি সেটাও তো এক ধরনের অভিনয়!' রিমিকা বসুর দিকে তাকিয়ে আনিকা বলল, 'তাই না, আম্মু!'

ঝাড়া বিশ মিনিট পর ডায়নিং টেবিলে এসে বসল রাহাদ। আনিকা মুচকি হেসে বলল, 'তোকে তো মোবাইলে এভাবে কথা বলতে দেখিনি কখনো! এমন কি তিন-চার দিন আগেও দেখিনি। তুই কি জানিস, মানুষ মোবাইলে কখন এত বেশি কথা বলে?'

রাহাদ কিছু বলার আগে রিমিকা বসু বললেন, 'মোবাইলে বেশি কথা বলার সময়-অসময় আছে নাকি! প্রয়োজনেই তো মানুষ কথা বলে। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের আর কাজ-কাম নেই কানের কাছে মোবাইল ধরে রাখবে! এখন ওসব কথা থাক, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

চিতল মাছের বড় একটা টুকরা প্লেটে নিয়ে রাহাদের দিকে তাকালেন আবিন চৌধুরী। কেমন যেন লাল হয়ে গেছে ছেলেটার চেহারাটা। মানুষ যখন খুব আনন্দে থাকে চেহারা তখন এমন লাল হয়ে যায়। এক টুকরো মাছ মুখে দিতে দিতে তিনি বললেন, 'তোমার কতগুলো বন্ধু আছে, রাহাদ?'

'অনেকগুলো।' মাংসের একটা টুকরোয় কামড় দিয়ে রাহাদ বলল।

'স্পেসিফিকলি বলতে পারবে?'

'ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন।'

'এরা সবাই কি তোমার প্রিয় বন্ধু?'

'হ্যাঁ, বাবস।'

'এত বন্ধু তো কখনো কারো প্রিয় হতে পারে না।' মাছের আরেকটা টুকরো মুখে দিয়ে আবিন চৌধুরী বললেন, 'তোমাকে এক মিনিট টাইম দেওয়া হলো, তুমি ভাবো, ভেবে বের করো তোমার আসলে কতজন প্রিয় বন্ধু আছে।'

'ভাবতে হবে না, বাবস। আমি এখনই বলে দিতে পারি।'

'বলো।'

সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারল না রাহাদ। একটু ভেবেই বলল, 'পাঁচজন।'

'সম্ভবত তোমার ওই পাঁচটা ফ্রেন্ড কাল বাসায় এসেছিল। আচ্ছা—।' প্লেটে এক চামচ ভাত নিয়ে আবিন চৌধুরী বললেন, 'কয়েকদিন ধরে তুমি তোমার মোবাইলটা বন্ধ রাখো নাকি?'

'জি, বাবস।'

'কেন!'

'সবার সঙ্গে এখন কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। অবশ্য আমার মোবাইলে মিসড কল অ্যালার্ট আছে। মোবাইল অপেন করার পর প্রয়োজনীয় হলে কল ব্যাক করি।'

'তোমার ওই পাঁচ বন্ধু একটা কথা বলেছে আনিকাকে। ওরা সবাই মিলে আমাদের বাসায় একদিন একটা রাত কাটাতে চায়। মোবাইলে পেলে ওরা হয়তো তোমাকেই কথাটা বলতো।'

'কাটাবে। কোনো অসুবিধা নেই তো, বাবস।'

'শুধু রাত কাটালেই তো হবে না, রাতটাকে আনন্দময় করে তুলতে হবে না!' ভাত মুখে দিতে নিয়েই সেটা আবার রেখে দিয়ে বললেন, 'রিমিকা, ভাতগুলো কেমন যেন শক্ত শক্ত মনে হচ্ছে।'

'স্যরি, অনেকক্ষণ ফুটানো হয়েছে। কিছু কিছু চাল আছে সহজে সেদ্ধ হয় না। এটা সম্ভবত সেরকম। তোমার জন্য আবার ভাত রান্না করি?'

'না থাক। মাছ খেয়েছি বেশ কয়েক টুকরো।' ভাতের প্লেটটা ঠেলে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে রাহাদের দিকে তাকিয়ে আবিন চৌধুরী বললেন, 'তোমার বন্ধুরা একটা রাত তাদের বাসার বাইরে কাটাবে, রাতটাকে উপভোগ্য করে তুলতে হবে না! এই তো কয়েকদিন আগে শাহরুখ খান আমাদের দেশ থেকে ঘুরে গেলেন। ভারতে বিত্তশালীদের বিয়ের অনুষ্ঠানে এক-দেড় কোটির বিনিময়ে নাচানাচি করেন তিনি। এক-দেড় কোটি না, আরো অনেক বেশি টাকা দিয়ে এরকম দু-চারটে শাহরুখ খানকে আনার সামর্থ্য আমার আছে। কিন্তু আনাটার প্রসেসিংটাই খুব জটিল। না হলে যত টাকাই লাগুক শাহরুখ খান আর আমির খানকে একসঙ্গে এই বাসায় আনতাম আমি। কিন্তু সেটা যেহেতু সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে আমাদের দেশের কোনো শিল্পীকে আনা যেতে পারত। কিন্তু আমাদের এমন কোনো শিল্পী আছে কি যাকে তোমাদের মতো ছেলেমেয়েরা পছন্দ করে?'

'একটাও নেই, বাবস।'

'তাহলে তোমরা একটা কাজ করতে পারো, তোমাদের কোনো ফাইভ স্টার হোটেলের একটা লবি ভাড়া করে দেই। তোমার সেখানে যেভাবে পারো আনন্দ করো।'

আনিকা কিছুটা বাধার স্বরে বলল, 'কিন্তু ওরা তো এই বাসায় থাকতে চেয়েছে। সম্ভবত ওরা আমাদের বাসার ছাদটা ইউজ করবে।'

'কিন্তু ওদের ইন্টারটেইনের জন্য কিছু করতে হবে না?'

'সেটা ওদের ওপর ছেড়ে দাও, ড্যাড।

'রাহাদের বাবস হিসেবে আমার তো একটা কিছু করতে হবে।'

'তুমি বরং ওদেরকে একটা বাজেট দিয়ে দাও।'

আবিন চৌধুরী রাহাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, আনিকার প্রস্তাবটা ঠিক আছে, রাহাদ?'

'ওদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখি, বাবস।'

'রাহাদ শোনো— ।' আবিন চৌধুরী রাহাদের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'আমার বাবা খুব সৎ এবং অভাবী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের অনেক ইচ্ছে পূরণ করতে পারেননি। তাই আমার খুব শখ তোমাদের দু ভাই-বোনের সব শখ পূরণ করব আমি।'

রাহাদ মায়ের দিকে তাকাল। তারপর আবার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মামের সব শখ পূরণ করবে না তুমি?'

'সেটাও করব।' আবিন চৌধুরী কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'তুমি এখনই তোমার একটা শখের কথা বলো, আমি সেটা পূরণ করার চেষ্টা করব।'

রাহাদ বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'স্রষ্টার সঙ্গে আমাকে একটু কথা বলিয়ে দিতে পারবে তুমি। তার সঙ্গে কথা বলার খুব শখ। অনেক জরুরী কিছু কথা আছে আমার তার সঙ্গে।'

'সেটা তো সম্ভব নয়। সেটা যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি নিজেই কথা বলতাম।' আবিন চৌধুরী চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন।

'আপাতত আমার আর কোনো শখ নেই, বাবস।'

'কোনো কিছু মনে হলে আমাকে বোলো।' আবিন চৌধুরী একটু থেমে বলেন. 'এবার তোমরা আমার একটা শখের কথা শোনো। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সামনের দিকে পা ফেলব আমি। কিন্তু সিদ্ধান্তটা আমাকে বাস্তবায়ন করতেই হবে।'

আনিকা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, 'কী সিদ্ধান্ত, ড্যাড?'

'আমি রাজনীতি করব, কোনো একটা পার্টিতে আজ-কালের মধ্যে জয়েন করব আমি।' আবিন চৌধুরী একে একে সবার দিকে তাকালেন।

'বাবস— ।' রাহাদ বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাজনীতি করে তুমি অনেকের অনেক কিছু পূরণ করতে পারবে, কিন্তু তোমার নিজের কিছু অপূর্ণতা আছে, আগামীতে অপূর্ণতা আরো বাড়বে। সেগুলো পূরণ করতে পারবে কী? আমি তোমাকে খুব সহজ একটা শখের কথা বলব, পারবে সেই সহজ শখটা পূরণ করতে? আমি আরো অনেকদিন তোমাকে বাবস বলে ডাকতে চাই, বাবস; মামের হাতের আদর পেতে চাই, আ-আপুর স্নেহ চাই।' শব্দ করে হেসে ওঠে রাহাদ, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় সে বলল, 'পাগলের মতো কথা বললাম, না!'

পেপারে দুটো ভালো খবর পেয়েছেন সাহাবুদ্দিন সাহেব। সকালে খবর দুটো কেটে টেবিলের ওপর রেখেছিলেন তিনি, জরুরী একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন তারপর। কিন্তু সন্ধ্যার একটু আগে বাসায় ফিরে দেখেন কাটা কাগজ দুটো নেই, স্রেফ উধাও হয়ে গেছে।

মেজাজ গরম হয়ে গেল তার। তবু ঠাণ্ডা মাথায় কাগজ দুটো খুঁজতে লাগলেন তিনি। মিসেস হেলেন ঘুমিয়ে আছেন। দিনের বেলা তিনি সাধারণত ঘুমান না। কিন্তু স্বামী বাসায় না থাকলে দুপুরের পর তিনি ঘুমাতে যান। কোনো কাজ থাকে না তখন, তাই ঘুমানো ছাড়া কোনো উপায়ও থাকে না। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর কাগজ দুটো না পেয়ে মন খারাপ করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন তিনি। মিসেস হেলেন কাত ফিরে শুতে নিতেই সাহাবুদ্দিন সাহেবকে দেখে ঝট করে উঠে বসলেন। সাহাবুদ্দিন সাহেব বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'দুটো কাগজ কেটে রেখেছিলাম সকালে, খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কাগজ মানে কী, তোমার ওই পেপার কাটিং?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার আলমারির ড্রয়ারে আছে।

'রেখেছিলাম তো এখানে।' টেবিলের ওপরটা দেখিয়ে সাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'ওখানে গেল কীভাবে?'

'আমি রেখেছি। ফ্যান ছাড়ার পর উড়ে গিয়েছিল, তাই ওখানে রাখা হয়েছে।' আলমারির কাছে গিয়ে কাগজ দুটো নিয়ে সাহাবুদ্দিন সাহেবের হাতে দিয়ে মিসেস হেলেন বললেন, 'কয়েক বছর ধরে তুমি যে কী ছাইপাশ জমাও না! কী হবে এসব জমিয়ে?'

'হয়তো কিছুই হবে না।' সাহাবুদ্দিন সাহেব হাতের কাগজ দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খবর দুটো পড়েছ? খুব ভালো খবর!'

'পড়ে তো দেখিনি।'

'তোমাদের অধিকাংশ মেয়েদের ওই একটাই দোষ, পেপারটা ভালো করে পড়তে চাও না। খালি শাড়ি-ব্লাউজের খবর পড়ো আর নতুন কোনো খাবার তৈরি করার খবর থাকলে সেটা পড়ো।' সাহাবুদ্দিন সাহেব দুটো কাগজের একটা ডান হাতে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে একটা খবর পড়ে শোনাই।' কাগজটা মেলে ধরলেন তিনি, কিন্তু কী ভেবে পড়লেন না সেটা। মিসেস হেলেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি খেয়াল করেছ, প্রায় চার বছর ধরে সন্ধ্যার চা'টা কেবল আমি আর তুমি শুধু খাই, আমাদের সঙ্গে কেউ থাকে না।'

'থাকে না সেটা না।' মিসেস হেলেন দুঃখী দুঃখী গলায় বলেন, 'আমরা আসলে কাউকে পাই না। দিন দিন মানুষ এত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, তার নিজেরই এখন সময় নেই, অন্যকে সময় দেবে কীভাবে?'

'ওই মেয়েটাকে একটু ডাকবে নাকি?'

'অন্তীকে?'

'হ্যাঁ, আজ ওই মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে চা খাব।'

'শুধু চা হলে তো হবে না, অন্য কিছু বানাতে হবে।'

'দাঁড়াও, আমি তাহলে বাইরে থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসি।'

'তুমি আবার বাইরে যাবে কখন, ঘরেই আমি কিছু বানিয়ে ফেলি।'

মিসেস হেলেন কিচেনের দিকে যেতে নিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চা বাদ দিয়ে কফি খাবে নাকি?'

'খাওয়া যায়, কিন্তু মেয়েটা আবার পছন্দ করে কি না!'

'তুমি বরং মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে আসো। আমি এর মধ্যে কিছু একটা বানিয়ে ফেলি।'

জানালার গ্রিলে একটা চড়ুই এসে বসল হঠাৎ। ঘুম ঘুম চোখে পাখিটার দিকে তাকাল অন্তী। বিকেলে ঘুমিয়ে ছিল সে, একটু আগে ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। চড়ুইটা কয়েকবার লাফিয়ে চলে গেল, একটু পর আবার ফিরে এলো।

দরজায় শব্দ হলো। কপাল কুঁচকে কান পাতল অন্তী। হ্যাঁ, দরজায় শব্দ হচ্ছে। কিন্তু দরজায় তো শব্দ হওয়ার কথা না, কলিংবেল তো আছে। ইন্ডিকেট লাইটটার দিকে তাকাল ও, লাইটটা জ্বলছে না। তার মানে

কারেন্ট নেই। উঠে বসল অন্তী। দ্রুত নেমে দরজা খুলতেই কিছুটা চমকে উঠল সে। এ বিল্ডিংয়ের দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে বড়সড় একটা প্যাকেট। অন্তীর দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে লোকটি বলল, 'এটা আপনার।'

'আমার!' হাত না বাড়িয়ে অন্তী বলল, 'কে পাঠিয়েছে?'

'একজন অল্প বয়সী স্যার পাঠিয়েছেন।'

'রাহাদ পাঠিয়েছে?'

'তা তো জানি না, ম্যাডাম।'

'উনি আছেন নিচে?'

'না, চলে গেছেন।'

অন্তী একটু চুপ হয়ে থেকে কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন তো?'

দারোয়ানটি হেসে বলল, 'আপনি অন্তী ম্যাডাম তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম বলেই এটা আমাকে দিয়েছেন।'

প্যাকেটটা হাতে নিল অন্তী। বেশ পাতলা প্যাকেট। দারোয়ান চলে যাচ্ছিল। 'একটু দাঁড়ান।' লোকটাকে থামিয়ে অন্তী ভেতরে গেল। একশ টাকার একটা নোট এনে লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিতেই আপত্তি জানাল সে। অন্তী মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'ছোটকালে বাবা একটা কথা বলেছিলেন আমাদের। কেউ যদি তোমাদের জন্য কোনো গিফট নিয়ে আসে তাকেও তোমরা কিছু গিফট দিও। আপনাকে সবসময় পান খেতে দেখি, এ টাকাটা দিয়ে পান খাবেন।'

দারোয়ান চলে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল অন্তী। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ, চেপে ধরল বুকের সঙ্গে। রাহাদ ছাড়া ইদানীং কারো গিফট পাঠানোর কথা না, সে ছাড়া এই বাসার ঠিকানাও জানে না কেউ।

মোবাইলটা হাতে নিল অন্তী। রাহাদকে ফোন করতে নিয়েই রেখে দিল সেটা। র‍্যাপিং খুলে ফেলল প্যাকেটটার। টুপ করে এক টুকরো কাগজ পড়ে গেল মেঝেতে। ভাঁজ করা কাগজটা তুলে খুলে ফেলল সে দ্রুত। ছোট্ট একটা চিঠি। নিচের দিকে তাকাল চিঠিটার। রাহাদ লিখেছে।

প্রিয় অন্তী, প্যাকেটর ভেতরে একটা জিনিস আছে। পছন্দ হোক অথবা না হোক, ওটা পড়বে। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়াবে না। আয়না দেখার আগে আমি দেখতে চাই তোমাকে। আমার আগে আয়না দেখবে এটা কি কখনো হয়?

ঠিক দু ঘণ্টা পর আমি তোমাকে ফোন করব। রাহাদ।

যত দ্রুত সম্ভব প্যাকেটটা খুলে ফেলল অন্তী। একটা শাড়ি আছে প্যাকেটটার ভেতর, হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি। শাড়িটা হাতে নিয়ে নাক আর মুখ গুঁজে দিল সেটার ভেতর। অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ, বুক শিহরিত একটা মায়া। কিন্তু হঠাৎ করে শক্ত হয়ে গেল ও— কখনো তো শাড়ি পরা হয়নি, শাড়ি কীভাবে পরতে হয় জানে না সে। ঝট করে রিয়ার মুখটা ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা হাতে নিল। একবার রিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রিসিভ করল রিয়া। অন্তী হাসিমুখে সব কিছু যখন খুলে বলল, ওপাশ থেকে রিয়াও হেসে হেসে বলল, কোনো সমস্যা নেই, আধা ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে সে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল অন্তী। শাড়িটার দিকে আবার তাকাল। আবেশে চোখ দুটো বুজে ফেলে শাড়িটার ভেতর নাক গুঁজে দিল সে আবার। দরজায় আবার শব্দ হলো। শাড়ি হাতে নিয়েই কিছুটা দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলল সে। সাহাবুদ্দিন সাহেব খুব আন্তরকিভাবে বললেন, 'তোমার হাতে পনের মিনিট সময় আছে?'

'আছে। প্রয়োজন হলে আরো দশ মিনিট বাড়িয়ে দেব।' অন্তী হাসতে হাসতে বলল।

'আমাদের বাসায় তাহলে একটু আসো না।'

শাড়িটা রেখে বাইরে বের হলো অন্তী। দরজাটা বন্ধ করে সাহাবুদ্দিন সাহেবকে বলল, 'কোনো প্রোগাম আছে নাকি, আঙ্কেল?'

'হ্যাঁ, একটা প্রোগাম আছে। আমরা তিনজন মিলে কফি খাব আর মন খুলে গল্প করব।' সাহাবুদ্দিন সাহেবও হাসতে হাসতে বলেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস হেলেন। হেসে দরজার পাশে সরে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের জন্য কিছু খাবার বানিয়েছি আমি, আগেই বলে রাখছি সম্ভবত খাবারগুলো ভালো হয়নি। চুলায় একদম গ্যাস নেই, এত অল্প গ্যাসে রান্না হয় নাকি!'

ঘরের ভেতর ঢুকেই অন্তী বলল, 'আপনাদের এই ফ্ল্যাটটাতে অন্যরকম একটা শান্তি আছে। সারাক্ষণ কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। গ্রামের বাড়ির ছায়াঘেরা বাড়ির মতো।'

ড্রইংরুমের সোফায় বসে সাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'খেতে খেতে আমরা একটা খবর শুনব। খবরটা আজকের পেপারে ছাপা হয়েছে।' কফির মগে চুমক দিয়ে খবরটা মেলে ধরে তিনি বললেন, 'রিয়াজউদ্দিন নামে এক ভদ্রলোক গাজিপুরের একটা জায়গায় দশতলা একটা বিল্ডিং বানাচ্ছেন। রাতে ঘুরে বেড়ানো সারা ঢাকা শহরে যত ভ্রাম্যমাণ মেয়ে আছে সবাইকে তিনি সেখানে থাকতে দেবেন। তাদেরকে তাদের অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনবেন। হাতের কাজ শেখাবেন তাদের, স্বাবলম্বী করে তুলবেন, পাল্টে দেবেন তাদের জীবন।' সাহাবুদ্দিন সাহেব একটু থেমে বললেন, 'আহারে!' গলার স্বরটা কেমন যেন পাল্টে গেল তার।

মিসেস হেলেন আর অন্তী একসঙ্গে সাহাবুদ্দিন সাহেবের দিকে তাকালেন। চোখে পানি এসে গেছে তার। তিনি কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন, 'আহারে, এরকম একটা কাজ যদি আমি করতে পারতাম। সারাজীবন আমরা সবাই কেবল নিজের জন্য ভাবি। সবাই যদি একটু একটু করে অন্যের জন্য ভাবতে শিখি, ভাবি, তাহলে অনেক কিছু সুন্দর হয়ে যাবে আমাদের দেশে।'

কোনো কথা বলল না অন্তী। কফির মগটা মুখের কাছে নিয়ে আবার রেখে দিল সেটা টেবিলে। মিসেস হেলেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কী, ভালো হয়নি কফিটা?'

কফি মুখে না নিয়েই অন্তী বলল, 'ভালো হয়েছে।'

'কই ভালো হয়েছে।' সাহাবুদ্দিন সাহেব মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি তো মুখেই দাওনি।'

'কিন্তু আপনি তো খাচ্ছেন। অনেক সময় নিজে খেতে হয় না, অন্যের খাওয়া দেখলেই টের পাওয়া যায় খাবার কেমন হয়েছে।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ করে তোমার মনটা খারাপ হয়ে গেল যে!' মিসেস হেলেন কফির মগটা অন্তীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করছ।'

'একদম না।' কফির মগটাতে চুমক দিয়ে অন্তী বলল, 'কফি কিন্তু খুবই মজার হয়েছে। এরকম মজার কফি আমি এর আগে কখনো খাইনি।'

সাহাবুদ্দিন সাহেব কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই কলিংবেলটা বেজে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন তিনি। 'দুলাভাই— ।' বলে একটা ছেলে ঘরে ঢুকে বলল, 'সারা ঢাকা শহরে যা জ্যাম, আপনাদের এখানে আসতে পুরো দুই ঘণ্টা সময় লাগল!'

'তা তো লাগারই কথা। আজ সারা ঢাকা শহর যেন থেমে আছে।' সাহাবুদ্দিন সাহেব আগের জায়গায় বসে বললেন, 'মোর্শেদ বসো।'

মোর্শেদ একটা সোফায় বসে সামনের দিকে তাকাল। অন্তীকে দেখে ভ্রু দুটো কুঁচকিয়ে বলল, 'আপনি এখানে?'

খুব গম্ভীর গলায় অন্তী বলল, 'আমি এখানে মানে!'

'আপনি পৃথুলা না?'

মিসেস হেলেন কফির একটা মগ মোর্শেদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'ও পৃথুলা হতে যাবে কেন, ওর নাম অন্তী।'

'অন্তী!' মোর্শেদ একটু চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে!'

'দেখতেই পারিস।' পাশের সোফায় বসে মিসেস হেলেন বললেন, 'ঢাকা শহরটা তো আর খুব বড় শহর না। ডানে-বাঁয়ে তাকালে সব পরিচিত মানুষ দিয়ে বোঝাই।'

'তবুও আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছে ওনাকে। দাঁড়াও একটু ভাবলেই মনে পড়ে যাবে।'

উঠে দাঁড়াল অন্তী। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস হেলেন বললেন, 'উঠলে যে, কিছুই তো খেলে না!'

'আমার জরুরী কিছু কাজ আছে আন্টি। কালকে এসে অনেক কিছু খেয়ে যাব।' আর কিছু না বলে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে এলো অন্তী। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে জানালার গ্রিলটা চেপে ধরল। লাইট জ্বালানো হয়নি, ঘরের ভেতর অন্ধকার, বাইরেও অন্ধকার। ঢাকার ধূসর আলোগুলো জ্বলে উঠেছে লাইটপোস্টে। বিছানায় এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল সে অন্ধকারেই।

দরজায় শব্দ হলো হঠাৎ। রিয়ার কথা মনে হলো, ও এসেছে সম্ভবত। ঘরের লাইটটা জ্বেলে দরজা খুলতেই চমকে উঠল সে। মোর্শেদ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। অন্তীর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানি আপনি পৃথুলা, আপনি এখানে কেন!'

'স্যরি, আমি অন্তী।' এটুকু বলেই দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল অন্তী। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে অনেকক্ষণ। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। তীব্র একটা গন্ধ আসছে জানালা দিয়ে— হাসনাহেনা ফুটেছে কোথাও।

রাহাদের থুতনির খাঁজে একটা আঙুল রেখে অন্তী বলল, 'কাল রাতে আমি আসতে পারিনি, এর জন্য তোমার যতটা না খারাপ লেগেছে, তার চেয়ে বেশি খারাপ লেগেছে আমার। আমি তো জানি, প্রতীক্ষার প্রহর কত দীর্ঘ!'

'কিন্তু তুমি তো আমার ফোনটা রিসিভ করতে পারতে!' মন খারাপ করে বলল রাহাদ।

'আমার ইচ্ছে করেনি, সোনা।' রাহাদের বুকে মাথা ঠেকাল অন্তী।

রাহাদ অন্তীর মুখটা দু হাতের আঁচলে তুলে চোখের দিকে তাকাল, যেন চোখ নয়, চোখের ভেতরটা দেখছে, ভেতরটা দেখা চেষ্টা করছে সে। চোখ দুটো আস্তে আস্তে ভিজে উঠছে অন্তীর। চোখের পাতা দুটো থিরথির করে কাঁপছে এবং এক সময় পাতা দুটো নামিয়ে ফেলে সে। রাহাদ খুব দূরাগত গলায় বলল, 'তুমি কি বলবে কী হয়েছিল তোমার?'

'কিছু একটা তো হয়েছিল, রাহাদ। কিন্তু আমি বলতে পারব না কী হয়েছিল।' অন্তী রাহাদকে কিছুটা জড়িয়ে ধরার মতো করে ধরে বলল, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো, রাহাদ?'

'যতটুকু করলে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়।' রাহাদ অন্তীর মাথার চুলের ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে বলল, 'মাম প্রায়ই একটা কথা বলেন, সম্পর্কের প্রথম শর্তই হচ্ছে বিশ্বাস।'

'আমি জানি, রাহাদ।' অন্তী রাহাদের বুকের সঙ্গে আবার মাথা ঠেকিয়ে বলল, 'কে কবে অবিশ্বস্ত হয়ে ভালোবাসতে পেরেছে! ভালোবাসতে গেলে নিজেকে আগে বিশ্বস্ত করতে হয়, ভালোবাসলে নিজেকে করতে হয় বিশ্বাসী।'

রাহাদ অন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো এসব বুঝি না, অন্তী। আগে কখনো এসবে জড়াইনি তো!'

'ভালোবাসায় জড়ানোর আগে ভালোবাসাময় অনেক কিছুই জানা যায় না। মানুষ ভালোবেসে অভিজ্ঞ হয়, মানুষ ভালোবেসে আরো ভালোবাসতে

শেখে— মানুষ ফুল ভালোবাসতে শেখে, গাছ ভালোবাসতে শেখে, চাঁদ-তারা-আকাশ-বাতাস সব ভালোবাসতে শেখে।'

'খুব সত্য কথা, অন্তী!' রাহাদ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আমার এখন সব ভালো লাগে, যা দেখি সব ভালো লাগে। আমার গান ভালো লাগে, কবিতা ভালো লাগে, অ্যাকুরিয়ামের মাছ ভালো লাগে, আমাদের বাসার সামনে প্রতিদিন যে ফকিরগুলো চিৎকার করে ভিক্ষা করে ওদেরও ভালো লাগে।'

'পাগল।' রাহাদের চুলগুলো এলোমেলো করে দেয় অন্তী।

'ভালোবেসে কেউ কি কখনো সুস্থ থাকে বলো? মানুষ তখন পাগল হয়ে যায়, অন্যরকম এক পাগল।'

'একটা জিনিস শুনবে?'

রাহাদ খুব আগ্রহ নিয়ে বলে, 'কী?'

'খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।'

'শুনব।'

'হৃদয়ের সব আকুলতা এক করে শুনতে হবে।'

'হৃদয়ের সব আকুলতা এক করব আমি।'

রাহাদের মাথা নিজের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল অন্তী। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে ধরে রাখার পর বলল, 'শুনতে পাচ্ছো কিছু? কান দুটো আরো একটু পেতে দাও, শরীরের সমস্ত ইন্দ্রীয় জাগিয়ে তোলো, আরো, আরো একটু গভীরতা আনো। শুনতে পাচ্ছো? ধুকধুক শব্দ হচ্ছে না, একটু থেমে থেমে কেঁপে উঠছে না বুকের মাঝখানটা, মাঝে মাঝে বেড়ে যাচ্ছে না রক্তের গতি? ওটা হচ্ছে আত্মার গান। ভালোবাসলে আত্মা গান গায়, রাহাদ।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথাটা সরিয়ে আনে রাহাদ। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অন্তীর দিকে, অনেকক্ষণ। তারপর চোখ দুটো একটু কাঁপিয়ে বলে, 'অন্তী, আমার যেন কেমন লাগছে!'

রাহাদের দুটো হাত নিজের হাতের মাঝে নিয়ে অন্তী বলল, 'আমি জানি তোমার কেমন লাগছে। একটু শান্ত হও সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু স্থির হও সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কখনো ঝড় দেখেছ তুমি?'

'দেখেছি, প্রকৃতির প্রচণ্ড দাপাদাপি দেখেছি।'

'তারপর?' অন্তী রাহাদের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাহাদ অবুঝের মতো বলল, 'তারপর কী?'

'তারপর প্রকৃতি কী শান্ত হয়ে যায়, কী অপরূপ মোহনীয় হয়ে ওঠে। অনেক গর্জানোর পর সমুদ্র যেমন, অনেক বৃষ্টির পর আকাশ যেমন।'

'ভালো কথা— ।' রাহাদ বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'খুব, খু-উ-ব পছন্দ হয়েছে আমার। কোথা থেকে কিনেছ শাড়িটা?'

'আমি তো কিনিনি।'

'কে কিনেছে?' কিছুটা চমকে ওঠে অন্তী।

'মাম কিনেছে।' রাহাদ গলাটা ভারী করে বলল, 'আমি কি শাড়ি চিনি!'

'মানুষ চেনো তো?' অন্তীও গলা ভারী করে বলল।

গভীর চোখে অন্তীর দিকে তাকিয়ে রাহাদ বলল, 'সেটাও চিনি না। সম্ভবত মানুষ চেনা সবচেয়ে কঠিন কাজ।'

'খুবই কঠিন, রাহাদ।'

দরজায় খটখট শব্দ হলো। রাহাদ হেসে হেসে বলল, 'কাম ইন।'

আলতো করে দরজায় ঠেলা দিল কান্তা। খুলে গেল সেটা। অবাক হয়ে ও বলল, 'দশ মিনিট টাইম চেয়েছিলে তোমরা, পনের মিনিট দিয়েছি। জরুরী কথা শেষ?'

অন্তী এগিয়ে এসে কান্তার একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, 'ভালোবাসার মানুষদের প্রতিটা কথাই জরুরী। এমন কি তারা সবচেয়ে ছোট্ট যে শব্দটা বলে, সেটাও।'

'তাই!'

'কেন, তুমি জানো না?' কান্তার হাতটা আরো একটু জোরে চেপে ধরে অন্তী, 'প্রতিটা বৃষ্টির ফোঁটা যেমন প্রতিটা গাছের জন্য জরুরী, প্রতিটা বাতাসের কণা যেমন প্রতিটা প্রাণীর জন্য জরুরী, প্রতিটা শব্দ তেমন প্রতিটা ভালোবাসার মানুষের জন্য জরুরী। কবে, কখন, কোথায় সত্যিকারের ভালোবাসার মানুষরা সময়ের অপচয় করেছে, নিজেকে উজার করে দিতে কার্পণ্য করেছে, দুজন দুজনকে আরো চিনে নিতে ভুল করেছে!'

'বাব্বাহ, এত কথা তো কখনো ভাবিনি।'

'কারণ তুমি এখনো কাউকে ভালোবাসোনি।'

রাহাদের দিকে তাকাল কান্তা। সমস্ত মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'আমি কল্পনাও করিনি তুই প্রেমে পড়বি।'

'কেন কল্পনা করিসনি?'

'এতদিন ধরে তোর সঙ্গে মিশছি, তোর মাঝে কখনো এসব দেখিনি। আমাদের মাঝে তুই হচ্ছিস সবচেয়ে অন্যরকম ছেলে, একেবারেই অন্যরকম। তোকে ছোঁয়া যায়, কিন্তু ধরা যায় না। তোকে নিয়ে ভাবা যায়,

কিন্তু স্বপ্ন দেখা যায় না। তুই হচ্ছিস রংধনুর মতো— বর্ণিল আবেশে সবাইকে যে মুগ্ধ করে, কিন্তু থাকে নাগালের বাইরে!'

'নাজুর কথা মনে আছে তোর?'

'কোন নাজু?'

'ওই ক্লাস টেন-এ পড়ার সময় বাসা থেকে পালিয়ে কাকে যেন বিয়ে করল।' রাহাদ কান্তার দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কী শান্ত-শিষ্ট ছিল মেয়েটা। দেখে বোঝারই উপায় ছিল না পালিয়ে বিয়ে করবে সে।'

'তার পরেরটুকু জানিস?'

'কী?'

'মেয়েটা মারাও গেছে।'

'মারা গেছে মানে!' কিছুটা শব্দ করে বলল কান্তা।

'পালিয়ে বিয়ে করার তিন মাস পর নিজের বাসায় ফিরে আসে সে। পরের দিন রাতে বিষ খেয়েছিল।' রাহাদ অন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মানুষ চেনা আসলেই খুব কঠিন, না?'

'ভালো কথা— ।' কান্তা চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'লুসি আবার এনগেজড হয়েছে, জানিস?'

'না তো!' রাহাদ খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কার সঙ্গে?'

'ফাহমির সঙ্গে।'

'ফাহমির সঙ্গে!' রাহাদ প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলল, 'ফাহমি না পিংকীর সঙ্গে এনগেজড ছিল!'

'ছিল, এখন নেই।'

'আমার এসব ভালো লাগে না, কান্তা। আমি ভয় পাই, আমার ভেতরটা কুঁকড়ে আসে। আমার বাবার এই যে বিত্তবৈভব, আমি তবুও অনিশ্চয়তায় ভুগি। আমি ভাবি, এই যে এত সম্পর্ক, ভাঙা-গড়া, টানাপোড়েন— তারপর? আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, মানুষ কি এখনো ভালোবাসতে পারে, না ভালোবাসতে ভুলে গেছে?'

'অবশ্যই মানুষ এখনো ভালোবাসতে পারে। মানুষ যেদিন ভালোবাসতে ভুলে যাবে সেদিন থেকে ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে যাবে।' কান্তা ভেজা ভেজা গলায় বলল, 'জীবনটা অনেক সুন্দর রে।'

অন্তী ম্লান হেসে বলল, 'অবশ্যই সুন্দর। তবে আরো সুন্দর হয়ে ওঠে যখন মানুষ ভালোবাসতে শেখে, ভালোবাসে।' অন্তী হঠাৎ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন কয়টা বাজে, রাহাদ?'

রাহাদ কিছু বলার আগেই কান্তা বলল, 'যে কয়টাই বাজুক, তোমাদের কিন্তু এখন যেতে দিচ্ছি না। আব্বু-আম্মু দুজনকেই ফোন করেছি, অফিস বাদ দিয়ে তারা আসছেন। আজ দুপুরে আমরা একসঙ্গে খাব।'

'আজ না, অন্য একদিন।' অন্তী কান্তার একটা গাল ছুঁয়ে বলল, 'রাহাদের যে এত চমৎকার বন্ধু আছে ভাবতেই আমার গর্ব হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে। চাইলে জীবনে অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু ভালো বন্ধু পাওয়া যায় না। রাহাদ খুব ভাগ্যবান।'

কান্তা অন্তীর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে দু কাঁধে দুটো হাত তুলে দিয়ে বলে, 'ভাগ্যবান তুমিও।'

রাহাদরা চলে যেতেই রাহুলকে ফোন করল কান্তা। তিনবার ফোন করার পর যখন ফোনটা রিসিভ করল না রাহুল, মেজাজটা খারাপ হয় গেল ওর। মোনাকে ফোন করার জন্য যেই বাটনে চাপ দেবে ফোনটা বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। কান্তা দ্রুত রিসিভ করে বলল, 'কোথায় ছিলি তুই, জাহান্নামে!'

'বাথরুমে।'

'বাথরুমে মানুষ এতক্ষণ থাকে!'

'এতক্ষণ থাকে না তো কতক্ষণ থাকে।' রাহুল কিছুটা স্যরি হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ওকে স্যরি, কী বলবি বল।'

'মজার একটা কথা বলার জন্য ফোন করেছিলাম তোকে। শুনে তুই পাগল হয়ে যাবি। এ ধরনের ঘটনা হ্যালির ধূমকেতুর মতো পঁচাত্তর বছরে একবার না, একশ বছরে একবার ঘটে।'

রাহুল খুব নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'বল।'

'এতো সাধারণভাবে বললি যে!'

'সাধারণভাবে বললাম কোথায়!'

'এ ধরনের ঘটনা শোনার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে বলতে হয়, বল।' কান্তা খুব শান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, তোর আগ্রহ কম, শুনতে ইচ্ছে করছে না তোর। বলবও না তোকে।'

'কী যে ফ্যাচর ফ্যাচর করিস না তুই! বল না!'

'শোনার ইচ্ছে থাকলে আবার কল দে আমাকে, তিনবার কল দেওয়ার পর আমি রিসিভ করব, তারপর বলব।' কেটে নিয়ে কান্তা মোনাকে করল, ওর ফোন বিজি। আবার চেষ্টা করল, আবার বিজি। মোনাকে অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে লুসিকে করল ও। একবার ফোন বাজার সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করল লুসি, 'কিরে কান্তা-পান্তা।'

'আটার লুচি শোন, তোর কাছে টাকা আছে?'

'কত টাকা?'

'আগে বল আছে কি-না?'

'আছে তো, কিন্তু কত টাকা সেটা বলবি তো?'

'সুইসে তিনটা পেস্ট্রি, একটা চকলেট আইসক্রিম আর একটা পেঁপের জ্যুস খেতে যত টাকা লাগে।'

'ওই পান্তা, এগুলো খেতে কয় টাকা লাগে রে!'

'যাই লাগুক, তোকে পৃথিবীর সেরা মজার একটা কথা বলব আমি। তার আগে আমার কাছে এই মর্মে কথা দিতে হবে, কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুইসে আসতে বলবি আমাকে।'

'পৃথিবীর সবচেয়ে মজার কথা!'

'হ্যাঁ, পৃথিবীর সবচেয়ে মজার কথা।'

'একটু আভাস দিবি।'

'আমাদের রাহাদ বাবুর মজার কথা।'

লুসি বিছানায় শুয়ে ছিল, কিছুটা লাফিয়ে ওঠার মতো করে উঠে বলল, 'আমি এই মর্মে কথা দিচ্ছি, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুইসে আসতে বলব তোকে, অতি শীঘ্র আসতে বলব। প্রমিজ প্রমিজ প্রমিজ!'

পুরো দুই মিনিট খরচ করে কান্তা যা বলল তা শুনে লুসি আরেকবার ছোটখাটো একটা লাফ দিয়ে বলল, 'সাচ্! সাচ্ বোলরাহিহে মেরি পেয়ারি দোস্ত! তুই এখনই সুইসে চলে আয়। মোনা, শ্রানতু আর রাহুলকে ফোন করছি আমি, ওদেরকেও আসতে বলি। আজ একটা কিছু করে ফেলব রে, পান্তা!'

কান্তা মোবাইলটা ওয়ারড্রবের রাখতেই বেজে উঠল সেটা। স্ক্রিনে রাহুলের নাম উঠেছে। মুচকি হাসল ও, কিন্তু রিসিভ করল না। সুইসে যেতে হবে, রেডি হতে হবে দ্রুত। রিং বাজা শেষ হওয়ার পর আবার বেজে উঠল সেটা এবং এক নাগারে সেটা বেজেই চলছে; কান্তাও মুচকি হাসছে।

বাসায় ফিরেই দুঃসংবাদটা শুনল রাহাদ— বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। চল্লিশ কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন তিনি, তাছাড়া চট্টগ্রামের হালিশহরের তার বড় গুদামটাতে পচা চাল পাওয়া গেছে। এসব চাল তিনি এনেছিলেন 'কাজ করো চাল নাও নামে' এক কর্মসূচীর জন্যে।

আনিকা হাতের নখগুলোতে নেইলপলিশ রিমুভার ঘষতে ঘষতে বলল, 'তোর কি মন খারাপ হলো, রাহাদ?'

'বাবসকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, এটা একটা মন খারাপের ব্যাপার না!'

'না, মোটেও মন খারাপের ব্যাপার না। শোন—।' রিমুভারের বোতলটা বন্ধ করে পাশে রেখে আনিকা বলল, 'বলতে পারিস ড্যাডের ক্যারিয়ারের জন্য এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। ড্যাড আগামীতে রাজনীতিতে যোগ দেবে। জেল খাটা কিংবা পুলিশ দ্বারা আঘাত পাওয়া লোকজনেরই তো আজকাল রাজনীতিতে কদর বেশি।'

'আচ্ছা আ-আপু—।' রাহাদ আনিকার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলল, 'বাবসকে কি হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেছে!'

'হাতে দড়ি দেবে কেন!' আনিকা একটু শব্দ করে বলল।

'ওই চোর-বদমাশদের হাতে দড়ি দেয় না পুলিশ!'

আনিকা কপাল কুঁচকে বলল, 'ড্যাড চোর না বদমাশ?'

'কোনোটাই না।'

'তাহলে?' সামনে নেমে আসা চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে আনিকা বলল, 'তাছাড়া কোনো চোর কিংবা পকেটমারকে কখনো স্যার বলতে দেখেছিস পুলিশকে?'

'না।'

'ড্যাডকে কিন্তু পুলিশ স্যার বলেছে।' আনিকা মাথার চুলগুলো আবার পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'পুলিশ এসে প্রথমে কী বলে জানিস?'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে রাহাদ। আনিকার প্রশ্নে ছোট্ট করে বলল, 'কী?'

'আবিন স্যার আছেন বাসায়?' আনিকা চোখ দুটো নাচিয়ে বলল, 'কী বুঝলি। শোন গাধা, যাকে যত পুলিশ ধরে, যে যত জেলে যায় সে হচ্ছে তত জনপ্রিয় নেতা। ড্যাডের ভাগ্যটা খুবই ভালো, রাজনীতিতে জয়েন করার আগেই নেতা হয়ে গেল।'

'মাম, কোথায় আ-আপু?'

'ড্যাডের সঙ্গে গেছে।'

'মামকেও ধরে নিয়ে গেছে নাকি!'

'আম্মুকে ধরবে কেন, আম্মু কিছু করেছে নাকি!' আনিকা বেশ আনন্দিত গলায় বলল, 'চল, আমরা একটা কাজ করি। শাহবাগ থেকে বড় একটা ফুলের মালা কিনে নিয়ে আসি।'

'ফুলের মালা দিয়ে কী হবে?'

'ড্যাড বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গে গলায় পরিয়ে দেব। ওই টিভিতে দেখিসনি জেল থেকে কোনো সাবেক মন্ত্রী কিংবা কোনো নেতা বের হলে গলায় মালার পরিয়ে দেয় না তার। আমরাও সেরকম পরাব। আমি গলায় মালা পরাব আর তুই একা একাই বলবি— আমার নেতা তোমার নেতা, আবিন নেতা আবিন নেতা। আবিন নেতার কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে।' আনিকা রাহাদের পিঠে একটা ছোট্ট করে থাপ্পর মেরে বলল, 'কী পারবি না?'

রাহাদ অবাক হয়ে বলল, 'বাবসকে কি এখনই ছেড়ে দেবে!'

'সেই সকাল এগাটার দিকে নিয়ে গেছে, এখন বাজে দেড়টা। ছাড়বে না! একটু পরেই ছেড়ে দেবে।'

'ড্যাডকে জেলে নেবে না।'

'এরকম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে কাউকে কখনো জেলে যেতে দেখিস? মানুষের জেল হয় দুটো কারণে— ।' আনিকা কোনার আঙুলটাতে বুড়ো আঙুল রেখে বলল, 'এক. রাজনৈতিক কারণে, দুই. চুরি-পকেটমারের মতো ছোটখাটো অপরাধের কারণে। আজকাল কোনো ছিনতাইকারী কিংবা কোনো ডাকাতেরও জেল হয় না। খুনীর তো আরো হয় না। সেখানে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার মতো উচ্চ শ্রেণীর একটা ব্যাপারে জেল— ।' আনিকা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'বাদ দে ওসব। সকাল সকাল কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

'আ-আপু— ।' রাহাদ আনিকার কথা জবাব না দিয়ে বলল, 'মাম কি একা বাবসকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে!'

'কে বলল মাম একা। ড্যাডের মতো এরকম একজন ব্যবসায়ীর আশপাশে সবসময় কেউ না কেউ থাকে। আর যারা থাকে তারা খুবই ক্ষমতাশালী হয়। সবচেয়ে বড় কথা ড্যাডের অনেক টাকা। যাদের অনেক টাকা তারা হচ্ছে এ পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ মানুষ।' আনিকা একটু বিরক্তি নিয়ে বলল, 'তোকে বললাম না বাদ দে এসব। বললি না, কোথায় গিয়েছিলি সকালে? সাধারণত এত সকালে কোথাও যাওয়া তো দূরের কথা, ঘুম থেকেই তো উঠিস না তুই!'

রাহাদ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাসার গেটে গাড়ির শব্দ হলো। আনিকা ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সম্ভবত ড্যাড এসেছে।' দোতালা থেকে নিচের দিকে নামতে লাগল আনিকা, পেছনে পেছনে রাহাদও।

গাড়ি থেকে নামলেন আবিন চৌধুরী। মনটা এমনিতেই ভালো ছিল, মেয়ে আর ছেলেটাকে দৌড়ে আসতে দেখে আরো ভালো হয়ে গেল। রিমিকা বসু কাছ ঘেঁষে এসে কিছুটা ফিসফিস করে বললেন, 'বাসায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে, এ নিয়ে কোনোরকম আলোচনা হবে না। কোনো ফোনও রিসিভ করবে না। ভালো হয় যদি মোবাইলটা বন্ধ রাখো।'

রাহাদের মোবাইলটা বেজে উঠল। হাতে নিয়েই হেসে ফেলল সে। অন্তী ওপাশ থেকে একটু রাগি গলায় বলল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'ফোন করেছিলে?'

'অনেকবার।'

'স্যরি। বাবসের সঙ্গে কথা বলছিলাম, শুনতে পাইনি।' রাহাদ কিছুটা উদ্বিগ্নের স্বরে বলল, 'কোনো সমস্যা, অন্তী?'

'হ্যাঁ, একটা সমস্যা হয়ে গেছে।'

'কী সমস্যা!' চমকে ওঠে রাহাদ।

'ভালো লাগছে না একা একা।'

'এটাই তোমার সমস্যা!'

'একা একা ভালো লাগছে না, এটা একটা সমস্যা না!'

'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে সমস্যা।' রাহাদ হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি বলো?'

'হয় আমার কাছে তোমার চলে আসা, অথবা তোমার কাছে আমার চলে যাওয়া।' অন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'একটা কাজ করি চলো।'

রাহাদ ছোট্ট করে বলল, 'কী?'

'দূরে কোথাও চলে যাই, অনেকদূর। যেখানে কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের।' অন্তী খুব শান্ত গলায় বলল, 'মানুষের এত কোলাহল ভালো লাগে না আমার, রাহাদ।'

'সত্যি যাবে!'

'তুমি নিয়ে গেলে যাব, চোখ বুজে যাব।'

'এখন কয়টা বাজে?'

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে অন্তী বলল, 'তিনটা।'

'তুমি রেডি থেকো, সন্ধ্যার আগেই আমি চলে আসব।' রাহাদ একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি কি আজ শাড়িটা পরবে? আমার মা সবসময় শাড়ি পরে। এত চমৎকার করে পরে! আমার কেন যেন মনে হয়, শাড়ি পরলেই একটা মেয়েকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মনে হয়।'

মোবাইলটা রেখে দিতেই দরজায় শব্দ হলো। ইন্ডিকেশন লাইটের দিকে তাকাল অন্তী, লাইটটা জ্বলছে, তার মানে কারেন্ট আছে। তাহলে কলিংবেল না বাজানোর কারণ কী! দরজায় আবার শব্দ হলো, একটু আস্তে শব্দ হলো। মনে হচ্ছে, কেউ একজন সাবধানে টোকা দিচ্ছে যাতে আশপাশের কেউ টের না পায়। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভয় ভয় গলায় অন্তী বলল, 'কে?'

ফিসফিস করে বলার মতো একজন বলল, 'আমি।'

'আমি কে?'

'চোর-ডাকাত কেউ না, দরজাটা খুলুন।'

গলাটা চেনার চেষ্টা করল অন্তী, চিনতে পারল না। কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে দরজা খুলল সে। মোর্শেদ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, কিছুটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, তাকে দেখে সাজা হলো। চোখ দুটো সরু করে তাকিয়ে বলল, 'আমি একটু ভেতরে আসতে চাই।'

'যা বলার বাইরে থেকে বলুন।'

'ভেতরে আসলে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আপনার নেই, আমার আছে।' রূঢ় গলায় বলল অন্তী।

আরো একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মোর্শেদ বলল, 'নিজেকে এভাবে লুকাচ্ছেন কেন?'

'আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। আমি বিরক্ত বোধ করছি। আপনি এখান থেকে চলে যান।'

'আপনার তো এখানে থাকার কথা না।'

'আপনারও তো এখানে থাকার কথা না।' অন্তী আগের চেয়ে রূঢ় গলায় বলল, 'মানুষের লাম্পট্য শুধু তার আচরণে প্রকাশ পায় না, কথাতেও প্রকাশ পায়। সুতরাং সাবধান। আমি পৃথুলা, না মৃদুলা সেটা জানার দায়িত্ব আপনার না। পৃথিবীতে অনেক দায়িত্ব আছে, আপনি সেগুলো পালন করুন, এতে আপনারও উপকার হবে, দেশেরও।'

'আপনি— ।'

মোর্শেদকে থামিয়ে দিয়ে অন্তী একটু শব্দ করে বলল, 'আর একটা কথাও না। আপনি চলে যান, না হলে মানুষ ডাকব আমি। প্লিজ।' দরজা বন্ধ করে দিল সে। চোখ ফেটে পানি আসছে তার। অনেকদিন নিজেকে মেরে ফেলার ইচ্ছে হয়নি তার, আজ হলো। বুকের ভেতরটা জ্বলছে, কামড়ে কামড়ে জ্বলছে।

রাহাদ খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, 'মাম, খুব খারাপ লাগছে। শরীরটা কেমন যেন করছে। দেখো তো, জ্বর আরো বেশি এসেছে কি-না।'

শুয়ে আছে রাহাদ। রিমিকা বসু মমতা মাখানো একটা হাত রাখলেন ছেলের কপালে। কিছু বললেন না। মায়ের হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলল, 'বললে না জ্বর আরো বেশি এসেছে কি-না?'

'না, বেশি হয়নি, আগের মতোই আছে।'

খুকখুক করে কেশে উঠল রাহাদ। কাশতে কাশতে চোখে পানি এসে গেছে তার। অনেকক্ষণ কাশার পর সে হাঁপানোর ভঙ্গিতে বলল, 'কাশিটাও সারছে না।'

'সেরে যাবে। সিজন চেঞ্জ তো, এখন অনেকেরই এরকম জ্বর-কাশি হচ্ছে।' রিমিকা বসু ম্লান হেসে বললেন, 'মানুষের যখন অসুখ হয় তখন খুব আপনজনের কথা মনে পড়ে, প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমার একবার জ্বর হয়েছিল। অনেকদিন ছিল জ্বরটা। আমার তখন আমার নানীর কথা মনে হতো।'

'তোমার নানী তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন ছিল?'

'প্রিয়জন আরো অনেকে ছিল, তবে নানী ছিল সবচেয়ে বেশি প্রিয়জন। আমার জন্মের পর থেকেই আমার মা খুব অসুস্থ ছিল। মায়ের বুকের দুধও পেতাম না আমি ঠিকমতো। নানী তখন আমাকে লাল-পালন করত।' রিমিকা বসু একটু হেসে রাহাদের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, 'তোমার প্রিয়জন কে বলো তো?'

রাহাদ অনেকক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রিয়জন তো পাল্টায়, মাম। তবে সবসময়ের জন্য প্রিয়জন হচ্ছো তুমি। যখন ক্যাম্পাসে থাকি তখন মনে হয় প্রিয়জন হচ্ছে রাহুল, শ্রানতু, মোনা, লুসি, কান্তা। আ-আপু যখন আমার চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে দেয় প্রিয়জন মনে তখন আ-আপুকে। বাবস যখন সব বিষয়ে অপার স্বাধীনতা দেয়, বাবস হয়ে হয়ে তখন প্রিয়জন। কখনো কখনো যখন একা থাকি, তখন অন্তী চলে আসে প্রিয়জনে।'

'অন্তী!'

'হ্যাঁ, অন্তী। ওর নাম বলিনি তোমাকে! স্যরি মাম, ওর নাম হচ্ছে অন্তী।' রাহাদ লাজুক হেসে বলল, 'মাম, ওকে কি একদিন বাসায় নিয়ে আসব?'

'একদিন না, আমি তো চাই তুমি ওকে প্রতিদিন নিয়ে আসো।' রিমিকা বসু কৌতুকভরা গলায় বললেন, 'অন্তী দেখতে কেমন, রাহাদ?'

'ঠিক কেমন দেখতে সেটা তো বলতে পারছি না, মাম।'

রিমিকা বসু হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার মতো?'

মায়ের কোলের ওপর মাথাটা রেখে রাহাদ খুব ভেজা ভেজা গলায় বলল, 'তুমি আমার মাম বলে না, তোমার মতো কোনো মেয়ে হতে পারে না, মাম। তুমি একেবারে আলাদা মাম, একেবারেই আলাদা।' রাহাদ একটু থেমে বলল, 'কিন্তু এভাবে আর হয়তো খুব বেশিদিন তোমার কোলে মাথা রাখতে পারব না, মাম।'

রিমিকা বসু চমকে উঠে বলেন, 'কেন!'

অন্তীর মুখটা ভেসে ওঠে রাহাদের। আলতো করে মায়ের একটা হাত চেপে ধরে ও বলল, 'তা তো জানি না, মাম।'

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে অন্তীর। কিছুতেই কোনো কিছু ভালো লাগছে না। জানালার পাশে দাঁড়াল, চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকাল, চাঁদ দেখল, তারা দেখল— না, মোটেই ভালো লাগছে না।

ঘরের চারপাশটা ভালো করে একবার দেখল সে। এত সুন্দর করে সাজানো ঘরটা। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, যেখানে যা থাকা দরকার তাই আছে। এ পৃথিবীর খুব কম মানুষ আছে যাদের এরকম ঘরে ঘুমানোর সৌভাগ্য হয়। আয়নার মতো চকচকে ঘরের মেঝে, গরমেও কী ঠাণ্ডা!

মেঝেতে শুতে ইচ্ছে করল অন্তীর, শুয়েও পড়ল। মাথার নিচে দু হাত দিয়ে ছাদের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। সাদা রঙের একটা প্রজাপতি বসে আছে ছাদের ডান পাশের কোনায়। চুপচাপ বসে আছে প্রাণীটি, একেবারে স্থির। আচ্ছা, প্রজাপতিদের মাঝে কি ভালোবাসা হয়? কথাটা মনে আসতেই হেসে ফেলে সে।

মেঝে থেকে উঠে বসে অন্তী। পাশের বাসা থেকে ঘুরে আসলে ভালো লাগতে পারে— কথাটা মনে হতেই উঠে দাঁড়ায় মেঝে থেকে। কিছুটা দৌড়ে গিয়ে কলিংবেল চাপতেই দরজা খুললেন হেলেন আন্টি। কিন্তু না, প্রতিদিন দরজা খুলে তিনি যেভাবে হাসি দেন, আজ দিলেন না তা। জড়িয়েও ধরলেন না মায়ের মতো। উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেসও করলেন না, কেমন আছো, মা?

অপমানিতের একটা চাহনি দিল অন্তী। ব্যাপারটা টেরও পেলেন মিসেস হেলেন, কিন্তু গুরুত্ব দিলেন না তিনি। দুজনেই চুপ। অন্তী হঠাৎ বলল, 'আন্টি, সম্ভবত আপনার মন খারাপ। আমি যাই।'

'এসেছো যখন, একটু বসো।' মিসেস হেলেন কিচেনের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'চা বানিয়ে আনছি।'

'আমি এখন চা খাব না।' আপত্তি জানাল অন্তী। তারপর কিছুটা ইতস্তত স্বরে বলল, 'আঙ্কেল কোথায়, আন্টি?'

'বেডরুমেই আছে।'

দ্বিতীয়বারের মতো অপমানিত বোধ করল অন্তী। এর আগে তার পায়ের শব্দে ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন আঙ্কেল, এগিয়ে এসে আদর করে হাত রাখতেন কাঁধে। আজ কথা শুনেও বের হলেন না। বিব্রত বোধ কাটাতে অন্তী বলল, 'আঙ্কেল কি ঘুমাচ্ছেন, আন্টি?'

'না।' মিসেস হেলেন একটা সোফায় বসে বললেন, 'এমনিই বসে আছে। না না, পেপার থেকে খবর কাটছে।'

'একটু ডাকা যাবে?'

'কোনো কথা আছে?'

'না, তেমন কথা নেই। একটু দেখা করব আর কি। বাসায় এলাম, কিন্তু দেখা হলো না, খারাপ লাগছে।' অন্তী একটু থেমে বলল, 'হয়তো আর কোনোদিন দেখাই হবে না।'

কপাল কুঁচকে মিসেস হেলেন অন্তীর দিকে তাকালেন। অন্তী অন্যদিকে তাকিয়ে দেয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবি দেখতে লাগল। সোফা থেকে উঠে এসে মিসেস হেলেন ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন, 'মানুষ এমন কেন বলো তো?'

দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্তী মিসেস হেলেনের চোখের দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ছলছল চোখে সে বলল, 'মানুষ না; প্রশ্নটা হবে— মানুষের ভাগ্য এমন কেন বলো তো?' অন্তী আবার অন্য দিকে তাকাল, 'মানুষের ভাগ্য নিয়ে এই প্রশ্নটা মানুষকে না, করতে হবে স্রষ্টাকে।'

'স্রষ্টাকে আমি কোথায় পাব?'

'আমিও তো পাই না।' অন্তী ম্লান হেসে বলল, 'চলুন না, দুজন মিলে স্রষ্টাকে খুঁজি। তার কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে আমার।'

মিসেস হেলেন ঝট করে অন্তীর একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'একটা প্রশ্ন করি তোমাকে?'

ঠোঁট দুটো চেপে ধরে চোখ দুটো হাসি হাসি করে ফেলল অন্তী। মিসেস হেলেনের হাতটা নিজের গালে ঠেকিয়ে বলল, 'আপনার প্রশ্নটা তো আমি জানি, আন্টি। মানুষের জীবনে কিছু প্রশ্ন আসে, খুবই সহজ প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা খুব কঠিন।' অন্তী হঠাৎ হেসে উঠে বলল, 'আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে, আন্টি। খুব আনন্দ নিয়ে আমি এখন এক কাপ চা খাব। ওই সময়টুকু আপনি আমার পাশে বসে থাকবেন। প্লিজ।'

কিচেনে চলে গেলেন মিসেস হেলেন। অন্তী আলতো করে দরজাটা চাপিয়ে বের হয়ে এলো ঘর থেকে। নিজের ঘরে এসে আবার থমকে দাঁড়াল সে। জানালার পাশে একটা মাধবীলতা উঁকি দিচ্ছে, অ্যাকুরিয়ামে ইচ্ছেমতো ভেসে বেড়াচ্ছে মাছগুলো. প্রজাপতিটাও ছাদের কোনায় চুপচাপ বসে আছে, তবু একা লাগছে। সবকিছু মনে হচ্ছে ফাঁকা, কোথাও কোনো ঠাঁই নেই, আশ্রয় নেই, নির্ভরতা নেই। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় একদিন তার জ্বর হলো, প্রচণ্ড জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে। তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে বাবা অন্য এক ঘুরে শুতেন। কান্নার শব্দ শুনে মাঝরাতের দিকে তিনি উঠে এসে কপালে হাত রাখলেন তার। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের একটা হাত ধরে বললেন, 'মা, আমার সঙ্গে একটু হাঁটো তো।'

কাঁপা কাঁপা পায়ে বাবার সঙ্গে হাঁটতে লাগল অন্তী। হাঁটতে হাঁটতে বাবা ঘরের বাইরে বের হলেন। আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোতে মেয়ের হাত ধরে তিনি আকাশের তারা দেখালেন, অন্ধকারে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা গাছ দেখালেন, শিশিরে ভজা ঘাস দেখালেন, তারপর খুব সরলভাবে বললেন, 'মা, এত কিছু দেখে কী বুঝলে?'

'কিছু তো বুঝলাম না, বাবা।'

'আরো একটু ভালো করে ভাবো।'

অন্তী ভাবল, কিন্তু কিছুই বুঝল না। অনেকক্ষণ পর মাথা এদিক-ওদিক ঝাঁকিয়ে বলল, 'কিছু বুঝলাম না, বাবা।

'স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতিটি সৃষ্টিই একা। তারা একা একা জন্মে, একা একা বেড়ে ওঠে, একা একা নিজের খাদ্য গ্রহণ করে, তারপর একা একাই একদিন মারা যায়। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। জ্বরে তুমি কাতরাচ্ছো, কিন্তু সেই কাতরতা আমি নিতে পারছি না, আমি কেবল অনুভব করতে পারছি, সহানুভূতি জানাতে পারছি তোমাকে। অন্য সবার মতো মানুষকেও একা একা চলতে হয়, বড় হতে হয়, বাধা-বিঘ্ন পার হতে হয়।' কথাটা শেষ করে বাবা একটু থেমে আবার বললেন, 'মা রে, এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'ভালো লাগছে বাবা, খুব ভালো লাগছে।'

'শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।' বলে বাবা একবার আকাশের দিকে তাকালেন। চাঁদের আলো বাবার চোখে থমকে দাঁড়ায়, ছলছল করে ওঠা বাবার চোখে পানি আর আলো খেলা করে, প্রকৃতি হঠাৎ করে কেমন যেন থেমে যায়— গাছের পাতা নড়ে না, বাতাসে ঘাসের ডগা কাঁপে না, ডানা ঝাঁপটায় না কোনো রাতের পাখি।

সকালে উঠে অন্তী দেখে একদম জ্বর নেই তার, সম্পূর্ণ সুস্থ সে। কিন্তু বাবার জ্বর এসেছে, চুপচাপ শুয়ে আছেন তিনি বিছানায়।

কতদিন আগের কথা! মানুষই তো পারে মানুষের ব্যথা নিতে, সম্পর্কের গভীরতায় একে অন্যের অন্তর স্পর্শ করতে, দূরে থেকেও হৃদয়ের উষ্ণতা জাগাতে। আকাশ যত বিশালই হোক, গাছ যত ছায়াবতীই হোক, সমুদ্র যত গভীরই হোক, মানুষের আশ্রয় শেষপর্যন্ত মানুষই।

দরজায় শব্দ হলো। ঘুরে তাকালো অন্তী। আলতো পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল দরজাটা। রিয়া দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। কিছুটা অবাক হয়ে অন্তী বলল, 'আপনি!'

'মানুষের বাসায় আমরা যাই কাজ করতে, গল্প করা হয় না কখনো। এখন এলাম গল্প করতে।' হাসতে হাসতে বলল রিয়া। কিন্তু তার হাসিটা কেমন যেন ম্লান মনে হলো অন্তীর।

'আমি কিন্তু একটু পরেই আপনাকে ফোন করতাম।'

'কেন?'

'হয়তো গল্প করতেই।'

'আমাদের প্রত্যেকেরই এত গল্প, কিন্তু শোনার মানুষ নেই।' রিয়া আবার হাসতে হাসতে বলল, 'আপনাকে সেদিন ভালো করে শাড়িটা পরাতে পারিনি। আজ আবার পরাতে ইচ্ছে করছে।'

'আমি কিন্তু আপনাকে এজন্যই ফোন করতে চেয়েছিলাম।'

'রাতে কোথাও যাবেন?'

'সম্ভবত না, তবে শাড়িটা পরে বসে থাকব। বসে বসে আকাশের তারা গুনব আর মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করব।' অন্তী রিয়ার একটা কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'কোনো সমস্যা, রিয়া? আপনার মুখটা কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগছে, চেহারাটাও ম্লান।'

মাথাটা কিছুক্ষণ নিচু করে রেখে রিয়া বলল, 'বাসা থেকে বের হয়ে এসেছি আমি।'

'কেন!'

'ভালো লাগছিল না।'

'আপনার হাজবেন্ড বাধা দেননি।'

'না।' রিয়া খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, 'সারাক্ষণ কেন যেন ঝগড়া লাগে আমাদের। অথচ চার বছর ভালোবেসে বিয়ে করেছি আমরা।' রিয়া আবার ম্লান হাসে, 'বিয়ের পর অধিকাংশ মানুষের ভালোবাসা কোথায় যেন হাওয়া হয়ে যায়, পড়ে থাকে কেবল অভিমান, চিৎকার আর ভাঙনের সুর।'

'এসব কী বলছেন আপনি?'

'প্রতিটা জিনিসের একটা উল্টো দিক আছে, ভালোবাসারও আছে।' রিয়া একটু তড়িঘড়ি করে বলে, 'আপনার শাড়িটা পরিয়ে দেই। বাসায় ফিরতে হবে তারপর।'

'বাসায় ফিরবেন আবার!'

'বিয়ের পর মেয়েদের কোথাও আশ্রয় থাকে না। স্বর্গ হোক আর নরক হোক, শেষপর্যন্ত ওই স্বামীর ঘরই। স্বামীর ঘরেও আশ্রয় হয় না অনেকের।'

'কোথায় যায় তারা তখন?'

'রাস্তায়।'

খুব বেশি যেন শব্দ না হয় তার জন্য দরজায় টোকা দিল রাহাদ। অন্তী দরজা খুলে দিল। রাহাদ হাসতে হাসতে বলল, 'রাত কি খুব বেশি হয়ে গেছে?'

'হোক না।' রাহাদের একটা হাত ধরে ঘরের মধ্যে এনে দরজা বন্ধ করে দেয় অন্তী, 'প্রকৃতির আসল রূপ দেখা যায় গভীর অন্ধকারে। প্রকৃতি সৃষ্টিও হয়েছে গভীর অন্ধকার থেকে। মানুষ প্রকৃতির অংশ, মানুষ মানুষকে চিনতে পারে অন্ধকারে থেকেই, অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেই মানুষ বুঝতে পারে আলোর পথটা কোন দিকে, অন্ধকারেই নিজেকে খুঁজে পায় মানুষ।'

'চলো, বের হই।'

'এখনই!' রাহাদকে বিছানায় বসিয়ে অন্তী জানালার পর্দটা সরিয়ে দিল, 'কিছুক্ষণ বসো না।'

বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে অন্তীর পাশে দাঁড়াল রাহাদ। ঘুরে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। অন্তীর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আকাশটা আজ কেমন যেন মেঘলা।'

'সন্ধ্যা থেকেই।'

'তারপরও দেখো, চাঁদ উঠবে আজ।'

রাহাদের মুখের দিকে তাকাল অন্তী। মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'তুমি সিওর ?'

রাহাদও হাসল, 'আমি সিওর।'

'কীভাবে?'

'প্রকৃতি ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানে। চাঁদ জানে তাকে আমরা ভালোবাসি। আমরা বের হলেই তাই ভালোবাসা জানাতেও সেও এসে

হাজির হবে আকাশে। কতদিন এমন হয়েছে আমার। চাঁদের আলোতে হাঁটব বলে বাসা থেকে বের হয়েছি। কিন্তু চাঁদ নেই আকাশে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর ঠিকই দেখা পেয়েছি তার।' রাহাদ অন্তীকে আরো একটু কাছে টেনে বলল, 'তোমার কখনো এমন হয়েছে?'

কিছু বলল না অন্তী। জানালার আরো কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল, জানালা দিয়ে যতদূর চোখ যায় তাকাল। ওই যে একটা মাথা উঁচু করা দালান, তার পাশে আরো কয়েকটা। কতগুলো রাস্তা, সোজা রাস্তা, বাঁকা রাস্তা, লম্বা রাস্তা— হরেকরকম রাস্তা। এই সব দালান আর রাস্তা পেরিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া সবুজ পার্ক। পাতার ফাঁক গলে চাঁদের আলো, আর সেই আলো পায়ে মেখে নিশাচর কিছু প্রাণীর সঙ্গে ওই যে অনেকগুলো মানুষ হাঁটছে, মানুষের ছায়া হাঁটছে, সঙ্গে একটা মেয়েও হাঁটছে।

এভাবেই প্রতিদিন চাঁদের আলো সঙ্গে নিয়ে মেয়েটা হাঁটে আর মানুষ খোঁজে। কতরকম মানুষ! মানুষ খুঁজতে খুঁজতে তার আর চাঁদ দেখা হয় না, আলোও খোঁজা হয় না।

রাহাদ অন্তীর কানের কাছে ফিসফিস করে বলার মতো করে বলল, 'তুমি কি কিছু ভাবছো?'

চমকে উঠল অন্তী। সেটা পাশ কাটিয়ে সে অনুভব করল রাহাদের নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাসের পরশ, কানের কাছে রিনিরিনি করে বেজে ওঠা মূর্ছনা— তুমি কি কিছু ভাবছ?

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল অন্তী। রাহাদের চিবুকের খাঁজে একটা আঙুল রেখে বলল, 'আজকের রাতটা কিন্তু অন্যরকম?'

'অবশ্যই অন্যরকম।'

'আজ রাতে পৃথিবীর কোথাও নতুন কোনো কল্যাণকর আবিষ্কার হচ্ছে হয়তো মানব সম্প্রদায়ের জন্য, সংকরায়নের নতুন কোনো চোখ ধাঁধানো ফুল পৃথিবীতে কোনো উদ্ভাবকের হাত ধরে, বৈচিত্র্যময় একটা প্রাণী পাওয়া যাবে আমাজনের গভীর জঙ্গলে, সমুদ্রে ভূমিষ্ঠ হবে হাজারো রকমের নতুন মাছ অথবা কোনো বিজ্ঞানীর চোখে ধরা দেবে নতুন কোনো নক্ষত্র— তারপরও সব কিছু ছাড়িয়ে, সব কিছুকে পেছনে ফেলে, একটা বদ্ধ ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে একজোড়া তরুণ-তরুণী যে ভালোবাসার কাব্য বুনছে, আজ, এই রাতে, সেটা হচ্ছে সেরা, সেটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ!'

দু হাতের আঁচলে মুখখানা তুলে ধরে রাহাদ মুগ্ধ চোখে অন্তীর দিকে তাকাল। মাথাটা একটু ঝুঁকে এনে বলল, 'মানুষের আসল সৌন্দর্য কোথায় বলতে পারবে?'

'হৃদয়ে, হৃদয়ের ঔদার্যে।'

'আর প্রশান্তি?'

'ত্যাগে।'

রাহাদের হাত দুটো নিজের হাতের ভেতর এনে অনেকক্ষণ চেপে ধরে রাখল অন্তী। তারপর খুব দূরাগত গলায় বলল, 'একটা কথা বলব তোমাকে?'

'বলো।'

'কথাটা রাখতে হবে কিন্তু।'

'রাখব।'

রাহাদের একেবারে চোখের দিকে তাকাল অন্তী। পলকহীন চোখ, স্থির। হঠাৎ চঞ্চল করে অন্তী বলল, 'মানুষের বুকে নাকি একটা গন্ধ আছে। সেই গন্ধে আসল মানুষ চেনা যায়।' অন্তী আর কিছু বলল না। রাহাদ ওর বুকটা মেলে দিল। আলতো করে কপাল আর নাক রাখল অন্তী সেই বুকে। আশ্চর্য এক অনুভব ছড়িয়ে পড়ল রাহাদের তন্ত্রে, অনুরণন হলো সমস্ত অস্তিত্বে, বুকের ভেতর বেজে উঠল অদ্ভুত এক সুর— পৃথিবীটা এত সুন্দর কেন! কেন এত বর্ণিল সবকিছু! চারদিকে কী অসীম মমতা, কী আবেশময় স্নিগ্ধতা— চুপচাপ, নিস্তব্ধ; অথচ কত জীবন্ত!

খুব সকালে আজ ঘুম থেকে উঠেছেন আবিন চৌধুরী। সাধারণত এত সকালে ঘুম থেকে ওঠেন না তিনি। তাড়াতাড়ি কিংবা দেরিতে যখনই বিছানায় যান না কেন ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সকাল আটটা। তারপর বিছানায় হালকা লিকারের এক মগ চা পান আর বিছানায় বসেই তিন তিনটা পেপার পড়া। পেপারের অবশ্য কোনো খবরই পুরোপুরি পড়া হয় না তার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হেডিং দেখেই রেখে দেওয়া হয়।

আবিন চৌধুরীর আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার কারণ হচ্ছে— সন্ধ্যায় একটা পাঁচ তারা হোটেলে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেবেন তিনি। এর জন্য একটা পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক, কোনো কোনো পত্রিকার সম্পাদক স্বয়ং, নামকরা কয়েকজন বুদ্ধিজীবী, বেশ কিছু গুণগ্রাহী এবং যে পার্টিতে যোগ দেবেন সেই পার্টির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সাধারণ সদস্যরাও উপস্থিত থাকবে এই পার্টিতে।

সব কয়টি পত্রিকায় রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উপলক্ষে অনুষ্ঠানের খবরটা ছাপা হওয়ার কথা, সম্ভবত হয়েছেও। কারণ দেশের প্রায় সব কয়টি পত্রিকায় তিনি বছরে কমপক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দেন, টিভিতেও দেন। সব কয়টি টিভি চ্যানেলও এ অনুষ্ঠানটা কভার করতে পার্টিতে আসবে।

হকার পেপার দেওয়ার সময় কলিংবেলে চাপ দেয়। আবিন চৌধুরী কলিংবেলের শব্দ শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। পেপারে নিজের ছবি দেখা, নিজের সম্বন্ধে ছাপা হওয়া খবর পড়া, খুবই মজাই ব্যাপার। তবে একজন মানুষের সম্বসময় যে ভালো খবর ছাপা হয়, তা না, মাঝে মাঝে খারাপ খবরও ছাপা হয়। একবার তার কোম্পানির নামে মধ্যম সারির একটা দৈনিক পত্রিকা খারাপ খবর ছেপেছিল। খবরটা তিনি পড়েনওনি। তার অনেক বন্ধু-বান্ধব ব্যাপারটা জানায় তাকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই

পত্রিকার সম্পাদককে ফোন করেন, সম্পাদক নিজেই সেটা রিসিভ করে মোসাহেবি হাসি দিয়ে বলেন, 'স্যার, আপনি তো জানেন, পত্রিকা চালানোর জন্য এসব খবর মাঝে মাঝে ছাপাতে হয়।'

'শুধু খবর ছাপলেই তো হয় না, আরো কিছু তো লাগে।' আবিন চৌধুরী গলাটা গম্ভীর করে বলেন, 'আমার অফিসে চলে আসুন।'

আধা ঘণ্টার মধ্যে ওই সম্পাদক আবিন চৌধুরীর অফিসে চলে আসেন। বড় একটা বিজ্ঞাপন ধরিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'খবর-টবর একটু বুঝে শুনে ছাপবেন। আরো বিজ্ঞাপন পৌঁছে যাবে আপনার পত্রিকায়।' ওই পত্রিকাতে আর কোনোদিন কোনো খারাপ খবর ছাপা হয়নি, বরং সম্পাদক সাহেবই তার খোঁজ-খবর নেন এবং এটা-ওটা গিফট পাঠান।

কলিংবেল বেজে উঠল। একটু পর নিচ থেকে পেপার নিয়ে এলো কাজের ছেলেটা। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি এবং তিনটা পেপারেই তার আজকে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার খবরটা ছাপা হয়েছে, ছবিও ছাপা হয়েছে। মনটা এতক্ষণ গুমোট হয়ে ছিল, ভালো হয়ে গেল সেটা। কাজের ছেলেটাকে ডেকে আরেক কাপ চা দিতে বললেন তিনি।

আনিকা ওর অবিন্যস্ত চুলগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে আবিন চৌধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল। হাঁই তুলে গুড মর্নিং জানাতেই তিনি বললেন, 'স্যরি মা, এত সকালে ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য।'

'নো প্রবলেম, ড্যাড।' আনিকা আবার একটা ছোট্ট হাঁই তুলে বলল, 'তুমি কি এখনই বাইরে যাবে, ড্যাড?'

'হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে নাস্তাটা সেরে বের হতে হবে আমাকে। বেশ কয়েকজনের বাসায় যেতে হবে। অনেককে এখনো জানানো হয়নি, যদিও তারা জানে, কিন্তু আমার নিজের গিয়ে একটু বলতে হবে। রাহাদ উঠেছে?'

'হ্যাঁ ড্যাড। ও আসছে।'

'আসছে না, এসে গেছি।' রাহাদ হাসতে হাসতে বলল, 'বাবস, শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছো তুমি!'

'চলো—।' আবিন চৌধুরী হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'ডায়নিং টেবিলে বসে কথা বলি।' ডায়নিং টেবিলে বসতে বসতে তিনি বললেন, 'এতো তাড়াতাড়ি রাজনীতিতে নামার কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার। বলতে পারো কিছুটা চাপে পড়েই রাজনীতিতে নামতে হচ্ছে আমাকে।'

রিমিকা বসু টেবিলে খাবার সাজাতে সাজাতে বললেন, 'তবে তোমার বাবা যদি রাজনীতিতে না নামতে চাইতেন তাহলে এই চাপটাও আসত না। তুমি তো জানো তোমার বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেটাও কিন্তু

এই রাজনীতিতে নামতে চাওয়ার কারণেই। প্রতিপক্ষ চাচ্ছে না তোমার বাবার মতো এমন অর্থশালী একজন মানুষ রাজনীতিতে জয়েন করুক।'

রাহাদ খুব সরল ভাবে বলল, 'রাজনীতিতে না নামলে কী হয়, বাবস?'

'অনেক কিছু হয় রাহাদ, অনেক কিছু হয়।' আবিন চৌধুরী একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'রাজনীতি হচ্ছে এক ধরনের ঢাল।'

'তবে রাজনীতিবিদরা কি ভালো মানুষ, বাবস?'

হেসে ফেললেন আবিন চৌধুরী। পুডিংয়ের একটা টুকরো মুখে দিয়ে তিনি ছেলের দিকে তাকালেন। রাহাদ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তিনি আরো এক টুকরো মুখে দিয়ে বললেন, 'রাজনীতিবিদরা হচ্ছে একটা দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। তারা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডাকাত, লুটেরা, দখলবাজ। একটা দেশে যতরকম অন্যায় হয়ে থাকে তার অধিকাংশ হয়ে থাকে রাজনীতিবিদদের দ্বারা। দেশে যত সংকট সৃষ্টি হয় সেটাও রাজনীতিবিদরা সৃষ্টি করেন। একটা দেশকে যত রকম ভাবে ক্ষতি করা যায়, তার সবটুকু ক্ষতি করে রাজনীতিবিদরা। ছিনতাইকারী বলো, অপহরণকারী বলো, শ্লীলতাহানীকারী বলো, সবার সঙ্গে রাজনীতিবিদদের একটা যোগাযোগ থাকে। সব খারাপ কাজের মূলে হচ্ছে রাজনীতিবিদ।'

'মানুষ তাহলে রাজনীতিবিদদের সম্মান করে কেন?'

'সম্মান করে না, ভয় করে।' আবিন চৌধুরী সোজা হয়ে বসে বলেন, 'ভয় আর সম্মান দুটো দুই জিনিস, রাহাদ।'

'রাজনীতিবিদরা তো এটা জানে, বাবস!'

'জানে।'

'তাদের লজ্জা করে না?'

শব্দ করে হেসে ফেললেন আবিন চৌধুরী। রিমিকা বসুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ প্রশ্নটার উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না আমার। উত্তরটা তুমি দাও।'

রিমিকা বসু রাহাদের পাশে গিয়ে মাথার চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বললেন, 'লজ্জা থাকলে রাজনীতি করা যায় না, রাহাদ!'

'শুধু লজ্জা না; তোমার ভেতর দেশপ্রেম থাকা যাবে না, মানুষের কল্যাণ করার ইচ্ছে থাকা যাবে না, সুস্থ চিন্তা করার মনোভাব থাকা যাবে না। আপাদমস্তকে তোমাকে হতে হবে ভণ্ড, ধূর্ত, মিথ্যাবাদী।'

'তুমি তাহলে এর ভেতর যাচ্ছো কেন, বাবস! এর চেয়ে কি তোমার ব্যবসা করাই ভালো না?'

ছেলের হাতের ওপর একটা হাত রেখে আবিন চৌধুরী বললেন, 'তোমাকে এখন শেষ কথাটা বলব আমি।' আবিন চৌধুরী একটু থেমে বললেন, 'পৃথিবীর কোথাও, কোনো দেশেই, রাজনীতির চেয়ে বড় ব্যবসা আর নেই। একমাত্র রাজনীতিবিদ হয়ে তুমি খারাপ কাজ করলেও মানুষ তোমার জন্য হাততালি দেবে, তোমার পেছনে পেছনে ঘুরবে, তোমার পক্ষে শ্লোগান দেবে।' আবিন চৌধুরী পরিপূর্ণ একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'রাজনীতি নিয়ে কথা বলা এখন বন্ধ। তোমার বন্ধুরা একদিন এই বাসায় কাটাতে চেয়েছিল, তুমি সবাইকে ইনভাইট করো, আজ রাতে ওরা এখানে কাটাবে। ওরা কে কী খেতে চায়, আমাকে জানিও, শেরাটন থেকে খাবার পাঠিয়ে দেব আমি।'

উঠে যাচ্ছিলেন আবিন চৌধুরী।

'বাবস।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাহাদ। এগিয়ে এসে ছেলের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'কিছু বলবে?'

'তুমিও কি তাহলে খুব খারাপ একজন মানুষ হয়ে যাচ্ছো, বাবস!'

গভীর চোখে ছেলের দিকে তাকালেন আবিন চৌধুরী। কিছু বললেন না, শুধু মুচকি একটা হাসি দিয়ে চলে গেলেন তিনি নিজের ঘরে। রিমিকা বসু এগিয়ে এসে রাহাদের একটা হাত ধরে বললেন, 'মানুষ যতই খারাপ হোক রাহাদ, শেষপর্যন্ত সে ভালো হয়ে যায়। তুমি কি তোমার বন্ধুদের এখনই ফোন করে জানিয়ে দেবে? আমার খুব ইচ্ছে, তোমরা আজ অনেক আনন্দ করবে, প্রাণ খুলে হাসবে, মন খুলে কথা বলবে।'

সন্ধ্যার আগেই সবাই এসে উপস্থিত। তবে সবচেয়ে পরে এসেছে লুসি। রাহাদের রুমে ঢুকেই বেশ চিৎকার করে বলল, 'অন্তী কোথায়?'

রাহাদ খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ওর তো আসার কথা না।'

'আসার কথা না মানে!' লুসি রাহাদের পিঠে জোরে একটা থাপ্পর মেরে বলল, 'আমরা সবাই একসঙ্গে হচ্ছি, তার মাঝে ও থাকবে না!'

'ও কি আমাদের কেউ?'

লুসির ঘিয়ে রঙের চেহারাটা লাল হয়ে গেল। প্রচণ্ড রেগে গেলে মুখটা এভাবে লাল হয়ে যায় ওর। ব্যাপারটা গিরগিটির গায়ের রঙ পরিবর্তন করার মতো, হঠাৎ বদলে যাওয়া! তবে রেগে লাল হয়ে গেলে খুব শান্ত হয়ে কথা বলে সে। রাহাদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গলাটা নিচু করে ও বলল, 'ও কি তোর কেউ?'

'তোর কি মনে হয়?'

লুসি আগের মতোই ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি যে প্রশ্নটা করেছি সেটার আগে উত্তর দে।'

'অন্তী— ।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাহাদ বলল, 'ও যে আমার কী এটা যদি আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারতাম তাহলে এতদিনে অন্তত একটা উপন্যাস লিখে ফেলতাম।' লুসির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে কিছুটা কাতর স্বরে বলল, 'তবে একটা কিছু তো বটেই।'

'তুই আমাদের কী?'

'বন্ধু।'

'তোর ও কেউ হলে, বন্ধু হিসেবে ও কি আমাদের কেউ না।'

'অবশ্যই কেউ।'

'তাহলে ও এখানে নেই কেন?'

রাহাদ লুসির ডান কানের দুলটা স্পর্শ করে বলল, 'সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করার চেয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয় না!'

কান্তা একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। সোজা হয়ে বসে ও বলল, 'লুসি, অন্তীকে ফোন কর তুই।'

লুসি কান্তার দিকে তাকাল, 'আগে ওকে জিজ্ঞেস করি, ও ফোন করেছিল কি না?' লুসি রাহাদের দিকে ফিরে তাকায়। চোখ দুটো একটু সরু করে বলল, 'কী, তুই ফোন করেছিলি?'

'করেছিলাম।'

'কী বলেছে?'

'আসবে না।'

ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে লুসি বলল, 'ওর নাম্বারটা দে, আমি কল করছি। আমরা সবাই অনেক পরিকল্পনা করে এখানে এসেছি। আর পরিকল্পনাটা করা হয়েছে ওকে ঘিরে। সেই ওকেই যদি না পাই এটা স্রেফ একটা নরমাল আড্ডা ছাড়া কিছু হবে না। এরকম নরমাল আড্ডা আমরা প্রতিদিনই দেই।' লুসি মোনার দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল, 'তোরা কিছু বলছিস না যে!'

'আমি আর রাহুল প্রথমেই এসে অন্তীর কথা জিজ্ঞেস করেছি। রাহাদ ভালো করে উত্তর দেয়নি। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপাতত কোনো কথা বলব না। চুপচাপ বসে থাকব।' মোনা অভিমানী গলায় বলল।

'শ্রানতু, তোর কি সমস্যা?' লুসি জিজ্ঞেস করে।

'এ মুহূর্তে আমি হচ্ছি দেখক, মানে দেখে যাব আর কি। সবাই যদি কথা বলে, তাহলে শুনবেটা কে? তোদের কথা শুনতে শুনতে ঘুম এসে

গিয়েছিল আমার।' একটা কুশন চেপে ধরে শ্রানতু আবার কাত হয় বিছানায়, 'আমি অবশ্য একটা জিনিস ভাবছি— প্রেম-ট্রেম করলে শরীরের ওজন কমে যায় নাকি?'

'প্রেম করলে শরীরের ওজন কমবে কেন?'

'না-ই যদি কমবে তবে রাহাদকে দেখেছিস, কেমন শুকিয়ে গেছে ও। শরীরের ওজন অনেকখানি কমে গেছে।'

খুক করে একটু কেশে রাহাদ বলল, 'ও কিছু না। দুদিন ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লুসি রাহাদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি তুই অনেক শুকিয়ে গেছিস। আজকাল সবাই তো শুকনোই থাকতে চায়। ভালো কথা— ।' রাহাদকে একটা খোঁচা দিল, 'নাম্বারটা দে।'

নাম্বার বলতে যাচ্ছিল রাহাদ। তার আগেই হাত দিয়ে ইশারা করে ওকে থামিয়ে দিয়ে লুসি বলল, 'ওপাশে ফোন রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের লাউড স্পিকার চালু করে দেব আমি, যাতে আমরা সবাই একসঙ্গে কথা শুনতে পারি। ওকে? রাহাদ, এবার নাম্বার বল?'

রাহাদ নাম্বার বলল, লুসি সেভাবে বাটন চিপল ওর মোবাইলে। কানের সঙ্গে ঠেকাল তারপর, রিং হচ্ছে ওপাশে। একটু পর রিসিভ হতেই গলাটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে লুসি বলল, 'এই মেয়ে, কোনো কথা বলবে না। আমি আগে বলব, তুমি শুনবে, শুনে ভালো করে জবাব দেবে।' সবার দিকে তাকিয়ে লুসি মিটিমিটি হেসে বলল, 'এই মুহূর্তে তোমার প্রিয় একজন মানুষের নাম বলো?'

কান থেকে মোবাইল সরিয়ে নাম্বারটা দেখল অন্তী, অচেনা নাম্বার। কিন্তু ওপাশের মেয়েটা এমন ভাবে কথা বলছে যেন কতদিনের পরিচিত সে! মোবাইলটা আবার কানে ঠেকিয়ে অন্তী বলল, 'আপনি কে বলছেন?'

'আমি যে-ই বলি, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'সব কিছুর আগে পরিচিত হওয়ার ব্যাপার থাকে। তাছাড়া— ।' অন্তী একটু থেমে বলল, 'আপনি আমার নাম্বার পেলেন কোথায়?'

'অবশ্যই কারো না কারো কাছে পেয়েছি।'

'এটা আমার নতুন নাম্বার। এ নাম্বারটা শুধু একজনই জানে।'

'ধরো, যে জানে সেই আমাকে দিয়েছে।'

'কিন্তু এ নাম্বারটা তো কাউকে দেওয়ার কথা না।'

'জগতের অনেক কিছুই তো দেওয়ার কথা না, হওয়ার কথা না। এই যে— ।' লুসি একটু ভেবে বলল, 'পৃথিবীর অনেক দেশে বরফ গলে যাচ্ছে,

সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা কি হওয়ার কথা? সুমদ্রের পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ আমাদের এই ঢাকা শহরের পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, এটাও তো হওয়ার কথা না। কী বুঝলে, জগতের অনেক কিছুই কারণে-অকারণে হয়ে থাকে। এবার বলো, এ মুহূর্তে তোমার প্রিয় মানুষ কে?'

কিছুক্ষণ থেমে থেকে অন্তী বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি খুব বিরক্ত হচ্ছি আপনার কথায়? চেনা নেই জানা নেই হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বললেন— প্রিয় মানুষ কে? এরকম একটা সেনসেটিভ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ করে দেওয়া যায় নাকি!'

'হঠাৎ করে দেওয়া না গেলে একটু ভেবে দাও। ফোনটা তো আমি করেছি, বিল উঠলে আমার উঠবে। আমি অপেক্ষা করছি, তোমার যতক্ষণ সময় লাগে ভেবে তারপর আমাকে উত্তর দাও।'

'না না, আমার ভাবতে হবে না। আমার কোনো প্রিয় মানুষ নেই।'

'একদম মিথ্যে বলবে না। মিথ্যা বলা মহাপাপ। পাপ করলে কিন্তু দোজখে যেতে হয়, দোজখে গেলে আগুনে পুড়তে হয়। ওসব দোজখে মোজখে যেতে হবে না, সত্যি কথাটা বলে ফেলো?'

'বললাম তো, আমার কোনো প্রিয় মানুষ নেই।'

'আবার মিথ্যে কথা। তুমি অলরেডি দুবার মিথ্যে কথা বলে ফেলেছ। লাস্ট চান্স, বলো তোমার প্রিয় মানুষ কে?'

'আমি এখন রাখব। কথা বলতে ভালো লাগছে না আমার।'

'ঠিক আছে, ভালো না লাগলে বলো না। আমিই বরং তোমার প্রিয় মানুষটা নাম বলে দেই— রাহাদ। কী, ঠিক বলেছি?'

অন্তী ওপাশ থেকে চমকে উঠে বলল, 'হ্যালো, আপনি কে বলছেন?'

লুসি কোনো কথা বলল না, কেটে দিল ফোনটা। একটু পর অন্তী কল ব্যাক করল, রিসিভ করল না সেটা। এভাবে তিনবার কল বাজার পর লুসি বলল, 'রাহাদ, এবার তোর নাম্বারটা বেজে উঠবে। খবরদার রিসিভ করবি না, তাহলে খেয়ে ফেলব কিন্তু তোকে।' কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাহাদের ফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে বের করতেই লুসি সেটা কেড়ে নিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করে দিল মোবাইলটা। তারপর কুটিল একটা হাসি দিয়ে বলল, 'মর শালা, তোর প্রিয়জনকে এবার খুঁজে মর!'

চুপচাপ বাসা থেকে বের হয়ে এলো রাহাদ। এখনো কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। কেবল বাইরের গেটের দারোয়ান নেহাল মিয়া একটা টুলের ওপর বসে আছে মূর্তির মতো। রাহাদকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত উঁচু করে সালাম দিল সে। রাহাদ একটু থেমে বলল, 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, কখন ফিরব বুঝতে পারছি না।'

'গাড়ি নেবেন না?'

'সকালে ওঠা হয় না অনেকদিন। গাড়িতে থাকলে ভালো করে সকালটাও দেখা হয় না। আজ রিকশায় বসে সকাল দেখব।'

বাসার বাইরের গেটের সামনে দাঁড়াল রাহাদ। বেশ কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মোড়ে। একটা রিকশা এগিয়ে এলো তাকে দেখে। রাহাদ মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'আপনার হাতে সময় আছে?'

বুঝতে পারল না রিকশওয়ালা। রাহাদ একটু হেসে বলল, 'আমি আজ অনেকক্ষণ রিকশায় চড়ে ঘুরব, আপনি সময় দিতে পারবেন? ভাড়া নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল রিকশাওয়ালা। রিকশায় উঠে বসল রাহাদ। রিকশাওয়ালা নিচু স্বরে বলল, 'কোন দিকে যাব?'

'আপনার যেদিকে ইচ্ছে।' রাহাদ বেশ সিরিয়াস একটা ভঙ্গি নিয়ে বলল, 'আপনার পছন্দের কোনো রাস্তা আছে, যে রাস্তায় গেলে মন ভালো হয়ে যায় আপনার।'

মাথা এদিক-ওদিক করল রিকশাওয়ালা।

'একটাও পছন্দের রাস্তা নেই? ঢাকা শহরে এত রাস্তা! একটা না একটা রাস্তা তো প্রিয় হওয়ার কথাই। আমার অবশ্য বেশ কয়েকটা প্রিয় রাস্তা আছে। ঢাকা ভার্সিটির ভেতরের সব রাস্তা ভালো লাগে আমার। বিশেষ করে বৃটিশ কাউন্সিলের রাস্তাটা। সংসদ ভবনের পেছন দিয়ে ক্রিসেন্ট লেক ঘেঁষে রাস্তাটাও আমার প্রিয়। শেরাটনের পাশ দিয়ে যে রোডটা

কাকরাইলের দিকে গেছে ওই রোডটা হচ্ছে সবচেয়ে ছায়াযুক্ত রাস্তা, পাশের গাছগুলো এত পুরাতন আর বড়! এ রাস্তা দুটো দিয়ে অবশ্য রিকশা চলতে দেয় না। ইদানীং নতুন একটা রাস্তা হয়েছে— রেডিসন হোটেলের ওপাশ দিয়ে, ক্যান্টনমেন্ট হয়ে একটা রাস্তা মিরপুর ক্যান্টনমেন্টের দিকে গেছে না, ওটাও খুব প্রিয় একটা রাস্তা। চারদিকে শুধু ফাঁকা আর ফাঁকা।'

খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনে রিকশাওয়ালা বলল, 'রিকশা চালানো কঠিন একটা কাজ। বুকে চাপ পড়ে, পায়ে চাপ পড়ে, সমস্ত শরীর অস্থির হয়ে যায়। অস্থির হওয়া শরীর নিয়ে আসলে কোনো কিছু উপভোগ করা যায় না।'

মুগ্ধ হয়ে গেল রাহাদ রিকশাওয়ালার কথা শুনে। মন ভালো না থাকলে কোনো কিছু উপভোগ করা যায় না, হৃদয়ে যন্ত্রণা হলে কোনো কিছু ভালো লাগে না, শরীর অসুস্থ থাকলে সবকিছুকে কেমন অসহ্য মনে হয়। রাহাদ হাসতে হাসতে বলল, 'সকালে চা খেয়েছেন?'

'না। আপনাকেই প্রথমে তুললাম তো। আপনাকে নামিয়ে নাস্তা করব।' রিকশাওয়ালা একটু থেমে বলল, 'পেটে খিদা থাকলেও কিন্তু কোনো কিছু ভালো লাগে না।'

'খুব সত্য কথা।' গুলশান এক নম্বরের বা পাশে পূর্ণিমা হোটেলটার সামনে রিকশাটা আসতেই রাহাদ রিকশাওয়ালাকে বলল, 'রিকশাটা এখানে থামান, এই হোটেলটার দোতালায় গিয়ে চলুন নাস্তা করব।'

দু চোখ কিছুটা বড় বড় করে রিকশাওয়ালা রাহাদের দিকে তাকাতেই রাহাদ বলল, 'চলুন না, একসঙ্গে নাস্তা করি। জীবনে হয়তো আপনার সঙ্গে আমার আর দেখাই হবে না।'

দেড়ঘণ্টা রিকশায় চড়ে কাটানোর পর ছায়াঘেরা একটা বাড়ির সামনে থামল রাহাদ। পকেট থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট বের করে বাড়িয়ে দিল রিকশাওয়ালার দিকে। নোটটা হাতে নিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, 'এত বড় নোট, ভাংতি পাব কোথায়?'

'ভাংতি লাগবে না। আপনার রিকশা চালানো ভালো লেগেছে আমার, সেজন্য পুরো টাকাটাই আপনার।'

টাকা হাতের মুঠোয় নিয়ে ম্লান একটা হাসি দিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, 'সম্ভবত আপনার মনটা ভালো নেই।'

'এ কথা মনে হলো কেন আপনার?'

'এত কথা বললেন আপনি, কিন্তু একবারও হাসতে দেখিনি আপনাকে। আমার বাবা লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু একটা কথা প্রতিদিন সুর করে বলতেন—জীবন যদি ভালো বাসো, কথার পর একটু হাসো। প্রতিদিন আমি সুযোগ পেলেই হাসি। দু বছর আগে আমার আঠার বছরের ছেলেটা বাসে চাপা পড়ে মারা গেল, তারপর থেকে আরো বেশি হাসি। হাসতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান! '

রাহাদ হেসে ফেলল। রিকশাওয়ালাটি চলে যেতেইঘেরা বাসাটির গেটে টোকা দিল, গেট খুলে দিল দারোয়ান। লম্বা একটা ফুলবাগান পেরিয়ে বাড়ির বড় কাঠের দরজাটার সামনে গিয়ে কলিংবেল চাপল রাহাদ। দরজা খুলে কিছুটা শব্দ করে ডাক্তার কামাল বললেন, 'রাহাদ, তুমি!'

'আঙ্কেল, একটা কথা বলতে এসেছি।'

'আগে ভেতরে আসো।' দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার কামাল বললেন, 'তোমার শরীর তো অনেক খারাপ হয়ে গেছে, রাহাদ। এত তাড়াতাড়ি তো খারাপ হওয়ার কথা না। যে ওষুধগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো ঠিক মতো খাচ্ছো তো?'

'জি।'

'এত সকালে তোমাকে দেখে বেশ চমকেই উঠেছিলাম। তোমার আব্বু-আম্মু ভালো আছেন? আনিকা?'

'সবাই ভালো আছে। আঙ্কেল— ।' রাহাদ কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি যে এই বাসায় এসেছি সেটা কেউ জানে না। কাউকে আমি জানাতেও চাই না। সেজন্য আমার মোবাইলটা বন্ধ করে রেখেছি। আমার অবশ্য আপনার ক্লিনিকে যাওয়া উচিত ছিল।'

'না না, বাসায় এসে খুব ভালো করেছ তুমি।'

'আজ আমি আপনার বাসায় অনেকক্ষণ থাকব। আমাকে একটু চেক-আপ করে দেবেন, কয়দিন ধরে একবারেই ভালো লাগছে না। কাউকে অবশ্য এটা বুঝতে দেইনি আমি। শরীর খারাপের কথা বললেই সবাই কেমন যেন অস্থির হয়ে যায়।' রাহাদ গলার স্বরটা দুঃখী দুঃখী করে বলল, 'আমার এটা ভালো লাগে না, আঙ্কেল।'

ড্রইংরুমের পর্দা সরিয়ে মিসেস কামাল রাহাদের একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন। দু হাত দিয়ে ওর মাথাটা চেপে ধরে নিজের কাঁধে ঠেকালেন। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললেন, 'মাই সান, আমার যদি সাধ্য থাকত, তোমার সবটুকু অসুখ আমি নিয়ে নিতাম। সেই অসুখে আমি ভুগতাম, আমি কষ্ট পেতাম, তবু তোমাকে কষ্ট পেতে দিতাম না।'

রাহাদ হঠাৎ কেশে ওঠে। শুকনো কাশিটা অনেকদিন ধরে ভোগাচ্ছে, কোনো কিছুতেই কোনো কিছু হচ্ছে না। কাঁধ থেকে মাথাটা তুলে মিসেস কামালের দিকে তাকাল ও। কাঁদছেন উনি। ওনার চোখের পানি দেখে ভিজে উঠল রাহাদের চোখ দুটোও।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি অন্তীর। রাহাদকে ফোন করা হয়েছিল, একবার না, তিনবার, একবারও রিসিভ করেনি। সকালে উঠে ফোন করেছে, ফোন বন্ধ। কোনো সমস্যা?

কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখে— রিয়া। অন্তী অবাক হয়ে বলল, 'আজ এত সকালে!'

'শেষ দেখা করতে আসলাম আপনার সঙ্গে।'

'শেষ দেখা মানে!'

'শেষ দেখা মানে শেষ দেখা।' রিয়া হাসার চেষ্টা করে, কিন্তু হাসিটা ঠিক হাসি হয়ে ওঠে না, কেমন ম্লান দেখায়। মাথা নিচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে কী একটা আঁকিবুকি করতে করতে বলল, 'এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি আজ।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আপাতত বাবার বাড়ি যাচ্ছি, তারপর কোথায় যাব বলতে পারব না।'

অন্তী আন্তরিকভাবে রিয়ার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'আবার ঝগড়া হয়েছে?'

'শুধু ঝগড়া না, আরো অনেক কিছু হয়েছে।' রিয়া নাক টানতে টানতে বলল, 'অথচ আমরা কত বছর একে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করলাম! আমার পরিবারের কেউই রাজি ছিল না এ বিয়েতে। সকলের অমতে আমিই জোর করে বিয়ে করেছিলাম ওকে। ওর অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। বিয়ের দিন মা চুপ করে তার সমস্ত গয়না আমার হাতে তুলে দিয়েছিল।'

রিয়াকে সোফায় বসিয়ে অন্তী ওর পাশে বসল। হাতটা আগের মতোই নিজের হাতের মুঠোয় রেখে খুব কাতর হয়ে বলল, 'ঝগড়াটা কী নিয়ে হয়েছিল, রিয়া?'

'সংসারে অনেক কিছু নিয়েই ঝগড়া লাগে, এর জন্য তেমন কোনো ইস্যু লাগে না। আসল কথা হচ্ছে— ভালোবাসা যখন কমে যায়, সব কিছুই তখন অসহ্য মনে হয়।'

অন্তী বোকার মতো চেহারা করে রিয়ার দিকে তাকায়, 'এত ভালোবাসাবাসি করার পর ভালোবাসা এক সময় কমে যায়, রিয়া? মানুষ তাহলে আরেক মানুষকে ভালোবাসে কেন, কেন এটা নিয়ে এতো পাগলামি করা হয়?'

'তা তো জানি না।'

রাহাদের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। অন্তী আলতো করে রিয়ার হাতটা ছেড়ে দিয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে জানালা দিয়ে— সম্ভবত দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে ঘরেও, চোখ বেয়ে নামা বৃষ্টি, হৃদয়ের সব দুঃখ উপচে পড়া বৃষ্টি, মন ভেজানো বৃষ্টি!

সব আত্মীয়ের বাসায় ফোন করে রিমিকা বসু যখন ক্লান্ত হয়ে মোবাইলটা ছুড়ে ফেলে দিলেন বিছানায়, ঠিক তখনই বেজে উঠলে সেটা। দ্রুত সেটা হাতে নিয়ে রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ডাক্তার কামাল বললেন, 'ভাবী, রাহাদের প্রেসক্রিপশনগুলো কোথায়?'

রিমিকা বসু অস্থির হয়ে কিছুটা শব্দ করে বললেন, 'ভাই সাহেব, রাহাদ কি আপনার ক্লিনিকে?'

'না, ক্লিনিকে না, বাসায়। খুব সকালে এসেছে।'

'আমি ওর প্রেসক্রিপশনগুলো নিয়ে এখনই আসছি।'

'না ভাবী আসতে হবে না আপনাকে। আমি শুধু ওর ওষুধগুলোর লিস্ট জানতে চাচ্ছি। ওর শেষ প্রেসক্রিপশনে কী কী ওষুধ দিয়েছিলাম, একটু বলুন তো প্লিজ।' কাগজ আর কলম হাতে নিলেন ডাক্তার কামাল।

রিমিকা বসু আগের চেয়ে অস্থির হয়ে বললেন, 'ভাই সাহেব, ওর অবস্থা কী খুব খারাপ হয়ে গেছে?'

'আপনি টেনস্ড হবেন না প্লিজ। আমি সব দেখছি। আপনি ওষুধগুলোর নাম বলুন, আমি দেখছি।'

'ভাই সাহেব, আমি এখনই চলে আসছি।'

ডাক্তার কামাল দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ভাবী, রাহাদ চায় না ও যে এখানে আছে সেটা কেউ জানুক। আমিও ওর কাছে কমিটেড কাউকে জানাব না ব্যাপারটা। রাহাদ তো শুধু আপনার ছেলে নয়, আমাদেরও ছেলে। কোনো চিন্তা করতে হবে না আপনার। প্লিজ, রিল্যাক্স থাকুন।'

বিকেলের একটু পরেই বাসা থেকে বের হচ্ছিল রাহাদ। মিসেস কামাল বললেন, 'রাতটা এখানে থেকে যাও না, সান।'

'না, আন্টি। বাসার ভেতর কেমন যেন দম আটকে আসছে।'

'গাড়ি তো আনোনি তুমি, ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি বাসায় পৌঁছে দেবে তোমাকে।' মিসেস কামাল সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

'গাড়িতে যাব না, আন্টি। রিকশায় যাব। রিকশায় চড়ার মধ্যে অন্যরকম একটা আনন্দ আছে।'

'একা একা যেতে পারবে তো?'

রাহাদ রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে বলল, 'শেষ পর্যন্ত তো সবাইকে একাই যেতে হয়, আন্টি!'

বাসার বাইরে এসে মোবাইলটা অন করল রাহাদ। ফোন করল অন্তীকে। অন্তী সেটা রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাহাদ খুব ক্লান্ত গলায় বলল, 'সারা রাত আজ তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে চাই, অন্তী। তুমি শুধু আমার মাথায় একটা হাত রেখো। বলো, রাখবে না?'

বাসা থেকে আজ বের হয়নি অন্তী। সারাদিন বাসায় বসেছিল আর অপেক্ষা করছিল। কোনো কোনো দিন এমন হয়— কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, কিছু করতে ইচ্ছে করে না, কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না, এমন কি বেঁচে থাকারও সাধ হয় না। আজ সেরকম একটা দিন। কিন্তু বিকেলে রাহাদের ফোনটাই পাল্টে দিল সব— না, জীবন এতটা পানসে নয়, এতটা স্থবির নয়। কোথাও না কোথাও একটা আনন্দ আছে, অন্ধকারের মাঝে একটুকরো আলো আছে!

বাবা প্রায়ই বলতেন, জীবনটা হচ্ছে আনন্দের, আনন্দটা খুঁজে নিতে হয়। বাবার কথা শুনে ছোট্ট অন্তী কিছু বুঝত না, কিন্তু একটু বড় হয়েই সে বুঝতে পারল, আনন্দটা খুঁজে পাওয়াও অনেক কষ্টের। কেউ কেউ আবার খুব অল্পতেই অনেক আনন্দ খুঁজে পায়। পাশের বাড়ির নমিতাদিদি খুব হাসতে পারতেন, কথায় কথায় হাসতেন তিনি, শব্দ করে হাসতেন। ছোটকালে তার হাসির শব্দে কোনো কোনো দিন ঘুম ভেঙে যেত তার। রাগ করে অন্তী একদিন বলেছিল, 'নমিতাদি, তুমি এতো শব্দ করে হাসো কেন বলো তো?'

মাথায় খুব মমতা নিয়ে কাঁধে একটা হাত রেখে নমিতাদি বলেছিলেন, 'দুঃখের কথা কাউকে বলতে হয় না, আনন্দের কথা বলতে হয়। সেইরকম কান্নার সময় কখনো শব্দ করতে হয় না, কারণ কান্না হচ্ছে দুঃখ। শব্দ করতে হয় হাসার সময়, কারণ হাসা হচ্ছে আনন্দ।' নমিতাদি শব্দ করে হেসে বললেন, 'কী, কিছু বুঝলি?'

খুব কালো ছিল নমিতাদি'র গায়ের রং। মানুষ যে কালো হতে পারে তা তাকে না দেখলে বোঝা যেত না। হুবহু তাদের দেবী কালীর মতো। চোখ দুটো বেলী ফুলের মতো সাদা। কেউ কেউ বলত, অন্ধকারে নমিতাকে দেখা না গেলেও ওর চোখ দুটো দেখা যায়। চোখ দুটো এতো সাদা ছিল!

পাড়ার যে মেয়েরই বিয়ে হতো নমিতাদি সেই বিয়েতেই যেতেন। প্রায় এক হাতেই বউ সাজানো থেকে শুরু করে সব করতেন। তখন তো তেমন বিউটি পার্লার ছিল না, সাজানোর ব্যাপারটা নির্ভর করতো সেই নমিতাদি'র ওপরেই। অপূর্ব করে কনে সাজাতে পারতেন তিনি।

একে একে তার বয়সী পাড়ার সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে নমিতাদি আরো বেশি করে হাসা শুরু করেন। কারণে-অকারণে হাসতে থাকেন তিনি। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলে নমিতাদি হাসতে হাসতেই বলতেন, 'পাড়ার সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সেই আনন্দেই হাসি।'

খুব সকালে একদিন ঘুম ভেঙে যায় অন্তীর। নমিতাদির বাসা থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। একটু পর কানে আসে— নমিতা মারা গেছে, আত্মহত্যা করেছে সে।

গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন নমিতাদি। কালীর মতো তার জিভটাও বের হয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে। বাবা অনেক কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে বলতেন, 'আনন্দের পাশেই দুঃখ লুকিয়ে থাকে, হাসির পাশে থাকে কান্না।' একটা মেয়ে জন্ম নেওয়ার পর শেষপর্যন্ত সে চায় একটা সংসার, এই সংসার না পাওয়ার কষ্টতেই নমিতাদি হাসতেন। মানুষ আনন্দে হাসে, নমিতাদি হাসতেন কষ্টে।

ঘরের ভেতর আর এক মুহূর্ত ভালো লাগছে না অন্তীর। রাহাদ কখন আসবে সেই অপেক্ষায় বসে আছে সে। দরজাটা বন্ধ, তবুও একটু পরপর দরজার দিকে তাকাচ্ছে, আকুতি ভরা চোখে তাকাচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটতে বেশ মজাই লাগে। অনেক কিছু দেখা যায়, অনেক কিছু খেয়াল করা যায়। রাস্তার পাশে লাগানো ছোট্ট একটা বাগান বিলাস গাছের ওপর একটা ফড়িং বসে আছে। মুগ্ধ হয়ে রাহাদ ফড়িংটার দিকে তাকাল। এত লাল রঙের ফড়িং সে কখনো দেখেনি।

রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটলে অনেক কিছু চিন্তাও করা যায়। কত কী ভাবা যায়! অদ্ভুত সব ভাবনা। আচ্ছা, ওই যে বিদ্যুতের তারের ওপর কয়েকটা কাক বসে আছে, কাকগুলোর শরীর এত চকচকে কেন! চিকচিক করে কেন তাদের পালকগুলো? ওরা কি কোনো শ্যাম্পু ব্যবহার করে, কন্ডিশনারযুক্ত শ্যাম্পু? এতো সিল্কি? রাহাদ ভেবে পায় না— পৃথিবীটা গোল, তবু উঁচু উঁচু দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে কীভাবে? আচ্ছা, এই যে সারা শহরে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। অনেক গাড়ি থেমে আছে, অনেক গাড়ি

চলছে। কিন্তু একদিন যদি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় সব গাড়ি! থেমে যাওয়া গাড়িগুলো হঠাৎ এলোপাতাড়ি চলতে শুরু করল, চলন্ত গাড়িগুলো যেমন ইচ্ছে তেমন গতিতে চলতে লাগল এদিক-ওদিক। মানুষের তখন কী হবে? মানুষ কি পারবে সেই ধ্বংসযজ্ঞ ঠেকাতে? কত মানুষ মারা যাবে এতে? রাহাদ হেসে ফেলে। কত রকমের চিন্তা করতে পারে মানুষ, কিন্তু অনেক চিন্তাই বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। মানুষের একদিন কোনো অসুখ থাকবে না, মানুষ অনেক বছর বাঁচবে, ইচ্ছে মতো পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করে তারপর সে চলে যাবে তার ইচ্ছে মতো। অধিকাংশ মানুষ এ চিন্তাটাই করে, সেই মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই করে, কিন্তু কই, চিন্তার বাস্তব রূপ কই!

লুসিদের বাসার সামনে এসে রাহাদের হঠাৎ মনে হলো, লুসি চকলেট পছন্দ করে। সামনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে অনেকগুলো চকলেট কিনল ও। পান্টের পকেটে চকলেটগুলো রেখে কলিংবেল টিপল বাসার। দরজা খুলে দিল লুসিই। রাহাদকে দেখেই প্রচণ্ড উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'এই একটু আগে আমি মনে মনে ভেবেছিলাম বাসায় আসবি তুই।' হাত ধরে রাহাদকে বাসার ভেতর এনে দরজাটা বন্ধ করে দিল লুসি, 'অবশ্য তোকে নিয়ে একটা স্বপ্নও দেখেছি কাল রাতে।'

'কী স্বপ্ন দেখেছিস?'

'আপাতত বলা যাবে না। শোন— ।' রাহাদের হাতটা ছেড়ে দিয়ে লুসি বলল, 'আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, কফি খাব আমি। তুই কি খাবি?'

'কফিই।'

লুসি ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে নিতেই ঘুরে দাঁড়ায়, 'আচ্ছা, তোকে এমন লাগছে কেন বল তো? কেমন যেন শুকিয়ে গেছিস তুই। কাশিটা কমেছে তোর?'

'কোনো সমস্যা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। কফি নিয়ে আয় তুই। তোকে আজ মজার একটা কথা বলব আমি।'

কফি বানিয়ে এনে রাহাদের পাশের সোফায় বসে লুসি বলল, 'স্বপ্নটা দেখেছি তোকে আর অন্তীকে নিয়ে। অন্তী কেমন আছে রে। ভালো কথা— ।' রাহাদের দিকে একটা মগ এগিয়ে দিয়ে লুসি বলল, 'ওর সঙ্গে তোর যোগাযোগ হলো কীভাবে, সেটা বল তো?'

'যোগাযোগ আর কীভাবে হবে! যেভাবে হয় সেভাবেই হয়েছে।'

'মেয়েটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা, ও কি আমাদের মতো দেখতে?' লুসি হাসতে হাসতে বলল।

'তোদের চেয়েও সুন্দর।' রাহাদও হাসতে থাকে।

চোখ দুটো কুঁচকে লুসি রাহাদের দিকে তাকায়, 'আমাদের চেয়ে সুন্দর! ওই গাধা, সুন্দর কাকে বলে তুই জানিস!'

'জানি, যাকে দেখলে মন শান্ত হয়ে যায়, সেই সুন্দর। সেই অর্থে অবশ্য তুইও সুন্দর। তোকে দেখলে, শ্রানতু, মোনা, কান্তা, রাহুলকে দেখলেও মনটা শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য জানিস— আমার প্রায়ই মনে হয় একদিন তোদের সবাইকে হারিয়ে ফেলব আমি, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও খুঁজে পাব না তোদের। যদিও তোদের দু-একজনকে পাই, তোরা তখন আমাকে দেখে চিনতে পারবি না।'

'এ কথাটা মনে হওয়ার কারণ কি তোর?'

'কী জানি বুঝতে পারি না।' কফির মগে চুমক দিয়ে রাহাদ বলল, 'তোকে মজার কথাটা বলি।' পকেট থেকে চকলেটগুলো বের করে লুসির হাতে দিয়ে বলল, 'আজ সারারাত বাইরে কাটাব।'

'একা!'

'অবশ্যই না, অন্তীকে নিয়ে।'

লুসি রাহাদের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'খুব মজা হবে রে। আমার খুব শখ যার সঙ্গে আমার রিলেশন হবে তার কাছে আমার শর্তই থাকবে মাসে অন্তত একটা রাত যেন আমরা বাইরে কাটাতে পারি।'

'অন্য কোনো কারণ নেই, রাতে সব কিছু শান্ত হয়ে যায়, থেমে যায় সব নিথর হয়ে, আকাশের নিচে বসে থাকতে থাকতে মনে হবে আকাশ আমাকে দেখছে। তারপর কোথাও হারিয়ে গেলে আর কেউ মনে না রাখুক আকাশ অন্তত মনে রাখবে— একটা ছেলে একদিন সারারাত আমার নিচে বসেছিল, চুপচাপ!'

দরজায় প্রচণ্ড শব্দ হলো অন্তীর। দৌড়ে এসে দরজা খুলে অন্তী দেখল মিসেস হেলেন দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। অন্তীর একটা হাত চেপে ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার আঙ্কেল যেন কেমন করছে। হাসপাতালে নিতে হবে ওকে। কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, মা।'

মিসেস হেলেনের হাতটা নিজের হাতের ভেতর নিয়ে অন্তী বলল, 'কোনো চিন্তা করবেন না, আন্টি। আপনি আঙ্কেলের কাছে যান, আমি সব ব্যবস্থা করছি।' মোবাইলটা হাতে নিয়ে কল করল অন্তী, 'গ্রীন গার্ডেন হসপিটাল? ১২২/৯৬, ধানমন্ডি, দ্রুত একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দেবেন,

প্লিজ।' ড্রেসটা চেঞ্জ করে মোবাইলটা আবার হাতে নিল অন্তী, 'রাহাদ, একটু গ্রীন গার্ডেন হাসপাতালে আসতে পারবে, দ্রুত, জরুরী?'

দেড় ঘণ্টা পর হাসপাতাল থেকে বের হলো অন্তী আর রাহাদ। সাহাবুদ্দিন সাহেব এখন বিপদমুক্ত, প্রেশারটা বেড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। আজকের রাতটা অবজারভেশনে রেখে কালকে রিলিজ দেওয়া হবে।

হাসপাতালের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখল রাহাদ। তারপর অন্তীর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আজ সারারাত আমরা বাইরে কাটাব।'

'তোমার শরীর খারাপ, কাশিটাও বেড়েছে। রাত করে বাইরে থাকলে শরীর আরো খারাপ করবে, কাশিটাও বেড়ে যাবে।'

'না, কিচ্ছু হবে না। আমরা আজ অনেক দূর যাব।' হলুদ ক্যাবটার দরজা খুলল রাহাদ। অন্তী উঠল, রাহাদও।

দুই ক্যান্টনমেন্টের মাঝখানের নতুন রাস্তার পাশে বসে আছে ওরা। আশপাশে বসে আছে আরো অনেকে। বেশির ভাগই একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। মেঘ ছিল আকাশে, মেঘ সরে গেল, অন্ধকার কেটে গিয়ে ঝকঝকে আলোতে ভেসে গেলে চারপাশ। আকাশে হরলিকস খাওয়া শিশুর মুখের মতো পূর্ণময় চাঁদ আর নিচে নগরায়নের মহড়া। জলাশয় ভরাট করে কনক্রিট নগরী গড়ে তোলার প্রস্তুতি। চিকচিকে বালিতে দৃষ্টিভ্রম, মনে হয় বিস্তীর্ণ নদী। নদীর জলের মতো থরে থরে সাজানো বালি, তার ওপর চাঁদের আলো, মনে হয় এই তো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, ধরা যাবে সোনালী ধোঁয়া, মুঠোর মাঝে বন্দী করে কাটানো যাবে কৃষ্ণপ্রহর।

রাহাদের কাঁধে হেলান দিয়ে বসে আছে অন্তী। অল্প অল্প বাতাস বইছে, কিছু চুল এসে পড়েছে ওর মুখে। চাঁদের আলো থমকে দাঁড়িয়েছে সেখানে। চুলের সেই ভাঁজের মাঝে ইচ্ছে মতো খেলে আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধে, ক্রমান্বয়ে তারপর শরীর বেয়ে পায়ে। আলোতে সব দেখা যায়, আর আলো-আঁধারীতে দেখা যায় জীবনের গোপন সৌন্দর্য, রহস্যময়তা। চাঁদের অকৃপণ আলোতে অন্তী এ মুহূর্তে এক রহস্যময়ী নারী, অপার্থিব মানবী।

আরো একটু আপন করে রাহাদের হাত ধরল অন্তী, মাথাটাও আরো ঠেসে দিল কাঁধে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাহাদ অনুভব করল— বুকের ভেতরটা সত্যি অনেক ফাঁকা, হাহাকার করা শূন্যতা, অব্যক্ত যন্ত্রণা!

'একটা কথা বলব?' বহুদিনের নীরবতা যেন ভাঙল অন্তী।

'বলো।'

'আজ আমরা হাঁটব।'

উঠে দাঁড়ালো অন্তী। হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গেল একটু সামনে। জ্যোৎস্না ভেজা বাতাসে চুলগুলো উড়ছে। মুগ্ধ-ভালোবাসায় রাহাদ দেখল— রুপালি আলোয় ঠিক হেঁটে নয়, ভেসে যাচ্ছে এক মায়াবতী, যার স্নিগ্ধ পরশে সবকিছু হয়ে যাচ্ছে মায়াবী, অপরূপ।

উঠে দাঁড়াল রাহাদও। পাশাপাশি হাঁটল। কাঁধে কাঁধ লাগছে, একজনের আঙুল ছুঁইছে অন্যজনের আঙুল, বেয়ারা বাতাসে ভেসে আসা চুল আছড়ে পড়ছে মুখে-চোখে-নাকে; সঙ্গে অন্তরে, হৃদয়ের গভীরে।

পুরনো কাঠের একটা বেঞ্চ দেখে অন্তী বলল, 'একটু বসি?' উত্তর পাওয়ার আগেই সে বসে পড়ল। একটু থেমে বসে পড়ল রাহাদও। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। নিস্তব্ধ, নিঝঝুম চারপাশ— ঝিরিঝিরি বাতাস, খাঁ খাঁ করা আকাশ আর গভীরতর অন্ধকার।

একটা হাত এগিয়ে দিল অন্তী, 'আমার হাতটা একটু ধরবে, একটু জোরে, অনেকক্ষণ, ক্লান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত।'

হাত ধরল রাহাদ। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করল অতল প্রশান্তি, অপার স্নিগ্ধতা, প্রগাঢ় মিতালি। যেন এরকমই সব, এভাবেই সবকিছু— নিটোল, পরিপূর্ণ, স্বপ্নের মতো।

দু হাত দিয়ে রিমিকা বসুর একটা হাত চেপে ধরল রাহাদ। হাতটা তুলে ঠোঁটের সঙ্গে ঠেকাল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'মাম, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?'

সমস্ত আদর দিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন রিমিকা বসু। আরেক হাত দিয়ে চোখ, কপাল, চুল নেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'একটুও না, বাবা।'

'বেশ কয়েকদিন ধরে অনেক রাত করে বাইরে থাকি আমি, কয়েকদিন আগে তো সারারাত কাটালাম।' মাথাটা নিচু করে রাহাদ বলল, 'সম্ভবত আমি নিশাচার প্রাণীর মতো হয়ে যাচ্ছি।'

রিমিকা বসু হেসে বললেন, 'হলে তো কোনো অসুবিধা দেখছি না।'

'নিশাচর প্রাণীদের একটা সুবিধা আছে, মাম।' খুকখুক করে কাশতে কাশতে রাহাদ বলল, 'চুপচাপ বসে থেকে পৃথিবীটা দেখা যায়। তুমি কি জানো—দিনের পৃথিবীর চেয়ে রাতের পৃথিবী অনেক সুন্দর?'

'তারায় তারায় খচিত আর বর্ণিল বলে?'

'না, পৃথিবীটা অনেক শান্ত থাকে বলে। মাঝে মাঝে দু একটা উল্কা খসে পড়ে, এই যা। তবে খুব গভীরভাবে কান পেতে রাখলে কিছু শব্দ শোনা যায়, মাম। তোমার মনে হবে চারপাশে ফিসফিস করার মতো শব্দ হচ্ছে, তুমি বুঝতে পারবে কারা যেন তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে ভাব বিনিময় করছে, খুব গোপনে, অদ্ভুত ছন্দে, অত্যন্ত আনন্দে।'

'প্রকৃতি কথা বলে, যেমন কুলকুল শব্দে বয়ে যাওয়া স্রোতে নদী কথা বলে। মনটা তখন অন্যরকম হয়ে যায়, না?' রিমিকা বসু হাসতে হাসতে বলেন, 'অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে তখন।'

'কেবল তখন না, আমার এখন সব সময় কত কিছু করতে ইচ্ছে করে, মাম।' রাহাদ মায়ের হাতটা আবার ঠোঁটে ঠেকিয়ে বুকে ঠেকায়। চেপে ধরে রাখে অনেকক্ষণ। 'আমার এখন সবুজ ঘাসে খালি পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ইচ্ছে করে অনেকক্ষণ, ভীষণ শব্দে

হাসতে ইচ্ছে করে, ফুল দেখতে ইচ্ছে করে, বড় বড় গাছ দেখলে সেই গাছগুলো দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা মাম— ।' রাহাদ রিমিকা বসুকে কিছুটা জড়িয়ে ধরার মতো করে ধরে বলল, 'তুমি কি কখনো কোনো বড় গাছ জড়িয়ে ধরেছ?'

'না ।'

'একবার আপন করে ধরে দেখো, বুকটা ভরে যাবে তোমার। মনে হবে এর চেয়ে আপন আর কেউ নেই, এর চেয়ে নির্ভরতার আর কেউ নেই ।'

'খুব নির্ভরতার?'

'খুব ।'

'অন্তীর চেয়েও?' মুখে দুষ্টমির হাসি রিমিকা বসুর ।

রাহাদ মায়ের চোখের দিকে তাকাল, 'প্রতিটি প্রিয় মানুষই নির্ভরতার। তাই তো তাদেরকে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, কোথাও বেশি দিন থাকতে ইচ্ছে করে না। মনের ভেতর পোড়ে, ফাঁকা হয়ে যায়, শূন্য মনে হয় সব কিছু।' রাহাদ আবার কাশতে কাশতে বলে, 'মাঝে মাঝে এমন কিছু ইচ্ছে জাগে, কোনো মানে খুঁজে পাই না এ সবের! আচ্ছা মাম, এত ইচ্ছে জাগছে কেন ইদানীং আমার?'

'তোমার কি কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?'

'না মাম, খাবার-দাবার নিয়ে আমার কোনো ইচ্ছে নেই। অনেক ইচ্ছের মধ্যে একটা ইচ্ছে খুব বেশি বেশি মনে হচ্ছে।' রাহাদ মাথাটা আবার নিচু করে বলে, 'খুব বেশি ।'

সমস্ত মমতা এক করে রিমিকা বসু রাহাদের মুখটা দু হাতের আঁচলে নিলেন। গভীরভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে টলটল চোখে বললেন, 'সেই ইচ্ছেটা কি, বাবা?'

'আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে, মাম।' অন্যদিকে তাকাল রাহাদ। রিমিকা বসুর টলটল জলগুলো ঝরে পড়ল গাল বেয়ে। কিচেনে দুটো গ্যাসের চুলো জ্বলছে তার মাঝেও কেমন যেন শীত লাগছে তার।

ডায়নিং টেবিলে বসতে বসতে আবিন চৌধুরী বললেন, 'আই অ্যাম এক্সট্রেমলি স্যরি। সকালে এই ডায়নিং টেবিলে ছাড়া তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখাই হয় না।'

'কোনো কোনো দিন তাও হয় না' আনিকা অভিমানী স্বরে বলল।

'পরীক্ষার আগে তোমরা কী করো, রাত জেগে পড়ো না। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় না তোমাদের? আমার এখন তেমন একটা পরীক্ষা

চলছে। রাজনীতি এমন একটা জিনিস এই পরীক্ষায় ফেইল করা যাবে না। তাহলে টিকে থাকা যাবে না।' আবিন চৌধুরী রাহাদের দিকে তাকালেন। মাথা নিচু করে আছে সে। তার দিকে একটু ঝুঁকে বসে তিনি বললেন, 'মাই সান, কোনো কারণে মন খারাপ?'

মাথা উঁচু করল রাহাদ, 'বুঝতে পারছি না, বাবস। মানুষ এত কিছু আবিষ্কার করছে কিন্তু মন ভালো করার ওষুধ আবিষ্কার করল না এ পর্যন্ত!'

'মন খারাপ হওয়ার কারণ কি, বাবস?' বন্ধুর মতো করে জিজ্ঞেস করলেন আবিন চৌধুরী। 'কারণটা যদি বলার মতো হয় আমাকে বলো, আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব তোমার মন ভালো করে দেওয়ার জন্য।'

'আমি জানি বাবস, তুমি তা পারবে। কিন্তু একটা ব্যাপার কি জানো।' রাহাদ মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'কিছু কিছু মন খারাপ আছে না বাবস, যে মন খারাপে খুব একটা খারাপ লাগে না, বরং ভালোই লাগে— ।'

'বুকের ভেতরটায় সুখ সুখ অনুভব হয়, দার্শনিক দার্শনিক ভাব জাগে নিজের মাঝে, চারপাশের সব কিছু মনে হয় কেমন ভাবলেশহীন।' রাহাদের দিকে হাসতে হাসতে আনিকা বলে, 'তাই না?'

'একদম ঠিক।' রাহাদ আনিকার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'অভিজ্ঞতার আলোকেই তো বললে, আ-আপু?'

কপট রাগে রাহাদের দিকে তাকিয়ে আনিকা বলল, 'সব কিছু জানতে অভিজ্ঞতা লাগে নাকি!'

'কিছু না কিছু লাগেই। বাবস— ।' আবিন চৌধুরীর দিকে একটু ঘুরে বসে রাহাদ বলল, 'যদিও আমি লিখতে জানি না, তবুও আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমার আর মামের রিলেশন নিয়ে একটা গল্প লিখব আমি।'

'আমাদের রিলেশনের গভীরতা এত অল্প না যে তুমি একটা গল্পের ভেতর সব কিছু শেষ করতে পারবে। এর জন্য তোমাকে উপন্যাস লিখতে হবে, তাও আবার ছোটখাটো উপন্যাস না।' হাত দিয়ে দেখিয়ে আবিন চৌধুরী বললেন, 'ইয়া বড় উপন্যাস। ভালো কথা— ।' আবিন চৌধুরী ছেলের চোখের দিকে তাকালেন, 'আমাদের প্রত্যেকের একটা করে গাড়ি আছে। আমারটা পছন্দ না হলে তুমি তোমার মায়েরটা নেবে, অথবা আনিকারটা নেবে। তোমারটাও অনেক সুন্দর গাড়ি। কিন্তু তা না করে তুমি ক্যাবে করে ঘুরে বেড়াও! ব্যাপারটা কেমন দেখায় না, বাবস! আরো একটা কথা— ।' চায়ের কাপে চুমুক দিলেন আবিন চৌধুরী, 'আমার ছেলে হয়ে তুমি যেখানে সেখানে আড্ডা দেবে, এটা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

তুমি যদি চাও ফাইভ স্টার হোটেলের একটা স্পেস ভাড়া করে দিতে পারি আমি তোমাকে। ওখানে বসে গল্প করতে পারো তোমরা।'

'ফাইভ স্টার হোটেলের মেঝেতে কি বাবস ছোট্ট ছোট্ট নীল ঘাসফুল ফোটে? লাল-নীল-হলুদ কোনো প্রজাপতি কি পাওয়া যায় ওখানে, যে প্রজাপতি নেচে নেচে উড়ে বেড়ায়? ওখানে কি গাছের কোনো শীতল ছায়া আছে? অযত্নে বেড়ে ওঠা অথচ মুগ্ধ করা কোনো গাছ কিংবা লতা আছে? ওখানে বসে কি মুক্ত চোখে আকাশ দেখা যায়? ওখানে ঝরা পাতার শব্দ শোনা যায়? শিশিরের যে টলটলে একটা রূপ আছে, সেই রূপটা কি ওখানে বসে দেখা যাবে? কিংবা প্রকৃতির ইচ্ছে মতো সেজে থাকা ওখানে বসে অনুভব করা যাবে?'

'না, তা যাবে না।'

'তাহলে হৃদয়ের সুর বাজবে কী করে, বাবস? আসল কথা যে মন বলে, সেই কথা আসবে কোথা থেকে। শুদ্ধতম ভালোবাসার আশ্রয় মিলবে তাহলে কোন সবুজ আসনে? বাবস— ।' রাহাদ গলাটা খাদে নামিয়ে বলল, 'ভালোবাসতে হলে একটা অবারিত আকাশ দরকার বাবস, না হলে ওটা ঠিক ভালোবাসা হয়ে দাঁড়ায় না, সময় কাটানোর মুহূর্ত মনে হয়।'

দরজাটা খোলাই ছিল। সাহাবুদ্দিন সাহেব আলতো করে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, পেছনে মিসেস হেলেনও। বেডরুমের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অন্তী। দরজা খোলার শব্দে এ রুমে চলে এলো সে। দুজনকে দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'দরজা কি খোলাই ছিল?'

'না হলে ঢুকলাম কীভাবে?' মিসেস হেলেন এগিয়ে এসে অন্তীর একটা হাত ধরে বললেন, 'দরজা খোলা ছিল কেন, মা?'

'লক লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইদানীং কেমন যেন অনেক কিছু ভুলে যাই। ভুলে আমার দুটো মোবাইলের একটা কোথায় যেন ফেলে রেখে এসেছি কাল।' সোফা দেখিয়ে অন্তী বলল, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না।'

মিসেস হেলেন বসলেন, সাহাবুদ্দিন সাহেব বসলেন না। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন অন্তীর দিকে। মাথায় একটা হাত রেখে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মারে, প্রথমত আমরা মানুষ। মানুষ হয়ে এ কথাটাই সবসময় ভুলে যাই আমরা। মানুষ ভুল কাজ করে, শুদ্ধ কাজ করে, সবরকম কাজই করে। মানুষের শুদ্ধ কাজ করার পেছনে যেমন অনেক কারণ থাকে, ভুল কাজ করার পেছনেও অনেক কারণ থাকে। কী, থাকে না?'

অন্তী অস্ফুট স্বরে বলল, 'জী, থাকে।'

'কিন্তু মানুষের আসল কাজ হচ্ছে ভুল করা মানুষকে ক্ষমা করা। মানুষ হিসেবে এই কাজটাই আমরা সবচেয়ে কম পারি। আমাদের নবী করিম (সঃ) সব মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন।' সাহাবুদ্দিন সাহেব কিছুটা অপরাধী গলায় বললেন, 'সেদিন তুমি বাসায় গিয়েছিলে, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করিনি, মানুষ হিসেবে এটাও আমার একটা ভুল। আমার এ ভুলের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, মা।'

'ছিঃ ছিঃ, এটা কী বলছেন আপনি?' ভীষণ বিব্রত বোধ করে অন্তী।

'আল্লাহ পাক এ দুনিয়ার সবকিছু পাঠিয়েছেন মানুষের জন্য। আমার মনে হয়, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে সেইসব মানুষ, যেসব মানুষ অন্য মানুষের কল্যাণ করে বেড়ায়।' সাহাবুদ্দিন সাহেব কাঁদছেন, 'বয়স হয়ে গেছে, এখনো বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। সেদিন তুমি যদি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে না যেতে তাহলে এতক্ষণে হয়তো আমাকে কবরে থাকতে হতো। আমি প্রতিদিন নামাজের পর তোমার জন্য এখন দোয়া করি— হে মাবুদ, তুমি এ মেয়েটার সব ভুল ক্ষমা করে দাও। তুমি ক্ষমাশীল।' সাহাবুদ্দিন সাহেব কথা বলছেন আর নাক টানছেন বাচ্চাদের মতো।

মোবাইলটা বেজে ওঠে অন্তীর। কিছুটা আলসেমী নিয়ে হাতে নেয় সেটটা। রাহাদ ফোন করেছে। দ্রুত সোজা হয়ে বসে সে। রিসিভ করে কিছু বলার আগেই রাহাদ বলল, 'তুমি কি আজ পুবের আকাশটা দেখেছ?'

'না তো।'

'একটু দেখবে?'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অন্তী। বিল্ডিং বেয়ে ওঠা মাধবীলতার ফাঁক গলে আকাশের দিকে তাকাল ও। চাঁদ উঠেছে, অর্ধ চাঁদ। রাহাদ দূরাগত গলায় বলল, 'জীবনের সব কিছুই আজকের এই চাঁদের মতো। পূর্ণ হয় না কোনো কিছু, অর্ধেকেই থেমে যায়।'

'আমি কিন্তু থামিনি। আমি কিন্তু আমার ভালোবাসার পুরোটাই দিয়েছি।' অন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'কী, পুরোটা পাওনি?'

'পেয়েছি।'

'তাহলে?' খুব গম্ভীর গলায় অন্তী বলল, 'প্রকৃত ভালোবাসা এমনই, পুরোটাই দিতে হয়, একটু কম হলে তাতে চলে না।'

খুক করে কেশে রাহাদ বলল, 'একটা জিনিস খুব ইচ্ছে করছে।'

শিশির পড়ার শব্দে অন্তী বলল, 'কী?'

'তোমার কোলে মাথা রেখে চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমার চুলে বিলি কাটবে আর আমি ছড়া বলব— আম্মা বলেন পড় রে সোনা, আব্বা বলেন মন দে, পাঠে আমার মন বসে না, কাঁঠালচাঁপার গন্ধে। তুমি চুলে বিলি কাটবে আর জ্যোৎস্নার গন্ধ নিয়ে আমি শুয়ে থাকব, এক সময় ঘুমিয়ে পড়ব। অনেক অনেকক্ষণ পর তুমি চুলগুলো একটু বেশি জোরে বিলি কেটে আমাকে ডাকবে, দেখবে আমি ঘুমিয়েই আছি। আরো কিছুক্ষণ পর তুমি আবার আমাকে ডাকবে, তখনো আমি ঘুমিয়ে আছি। এবং একসময় তুমি খেয়াল করলে, সত্যি সত্যি আমার ঘুম ভাঙছে না, কিছুতেই ভাঙছে না।'

'এই, এই রাহাদ, তুমি কী বলছ এসব?'

অসম্ভব ক্লান্ত গলায় রাহাদ বলল, 'জীবনের শেষ গল্পটা বললাম।'

'তোমার গলা এমন শোনাচ্ছে কেন, রাহাদ!'

রাহাদ আর কোনো কথা বলে না। চাঁদের ঘোলাটে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে তার চোখে, মুখে, কপালে। কিন্তু চাঁদের আলো দেখার কোনো মুগ্ধতা নেই তার চেহারায়। স্থির সব কিছু। আলোগুলো থমকেই আছে!

রিমিকা বসু টের পেলেন ঠিক রাতের শেষে। ম্লান আলোর চাঁদটা পশ্চিমে ঢলে পড়েছে তখন, আজকের মতো চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। খুব সকালে যেসব পাখির ঘুম ভাঙে, ঘুম ভাঙেনি তাদের কারোরই। আলো আর আঁধারের সন্ধিক্ষণে, পৃথিবীটাকে যখন খুব নতুন প্রেমিকার মতো রহস্যময় মনে হয়, ফুরফুরে বাতাসে যখন নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, টুপ করে বৃন্ত থেকে ঝরে পড়ে যেভাবে মাটিতে স্থির হয়ে যায় ফুল, সেভাবে স্থির হয়ে আছে রাহাদ। কেবল তার চোখ দুটো তখনো খোলা। আর গোড়া কেটে ফেলা লতানো গাছের মতো খাট থেকে মেঝের দিকে নেতিয়ে আছে যে বাম হাতটা, তার সঙ্গে আলতোভাবে লেগে আছে একটা কাগজ। কাগজটা হাতে নিলেন তিনি। মেলে ধরলেন চোখের সামনে।

মাম, তুমি কি জানো তুমি আমার কতটুকু প্রিয়! প্রতিদিন যে আমি কষ্ট পেতাম, যন্ত্রণায় ছটফট করতাম, কিন্তু তোমার মুখ দেখলেই সেসব কোথায় চলে যেত! তোমাকে দেখার জন্য তাই কোনো কোনো রাতে আমি তোমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে আছো, বাবস ঘুমিয়ে আছে, ডাকতাম না তাই তোমাদের। রাত হলেই কষ্টটা বাড়ত তো!

খুব আশ্চর্য লাগে মাম— এইচআইভি ভাইরাস আমার দেহে আসলো কীভাবে! কোনো খারাপ অভ্যাস তো ছিল না আমার। তবে কি ওই যে আমার একবার রক্তের প্রয়োজন হলো, রক্ত দিতে হলো, ওগুলো নষ্ট রক্ত ছিল, এইচআইভি সংক্রামিত রক্ত ছিল? এছাড়া আমি তো কোনো...।

মাম, এটা এমন একটা রোগ, যা কাউকে বলা যায় না, বলতে সবাই লজ্জা পায়। লজ্জা পেয়েছিলে তোমরাও। তাই এ রোগটার কথা তুমি জানতে, বাবস জানত, আ-আপু

জানত আর ডাঃ আঙ্কেলের ফ্যামিলি জানত। তোমরা আর কাউকে জানতে দাওনি, এমনকি আমাকেও না। অথচ আমি জেনে গিয়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে দেইনি তোমাদের।

কথা বলতে বলতে তোমাকে একদিন একটা কথা বলেছিলাম হাসতে হাসতে— জীবনটা ভালোবাসাহীন ভাবেই কেটে যাচ্ছে, আপন হয়ে কেউ ভালোবাসল না, স্বার্থহীনভাবে কেউ হাত ধরল না, স্বপ্নের বুদবুদ জাগাল না বুকের ভেতর। বোকা মাম, ওটা কিন্তু একটা গান ছিল। কিন্তু তুমি চিরাচরিত বুদ্ধিমান মায়ের মতো একটা কাজ করলে, কয়েকদিন পর অন্তী নামে একটা মেয়ের আবির্ভাব হলো আমার জীবনে। আমি জেনে গেলাম মেয়েটা কে। তবুও আমি পাল্টে গেলাম, ভালোবাসা পেলাম, স্বপ্নের বুদবুদ জাগল আমার বুকের ভেতর, মননে, অস্তিত্বে।

এত বড় একটা অসুখ নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি অথচ তোমরা কেউ আমাকে বুঝতে দাওনি। বাবস খুব স্বাভাবিক থেকেছে, নির্ভার বাবার মতো কথা বলেছে, দায়িত্ববান অভিভাবকের মতো সবসময় পাশে থেকেছে। আ-আপু তার স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় আমার সঙ্গে কথা বলেছে, আনন্দ করেছে, খুনসুটি করেছে। কেবল তুমি সমসময় গম্ভীর থাকতে, একটা বিষাদ এসে তোমার চেহারায় ছায়া ফেলত। আড়ালে-আবডালে প্রায়ই তুমি কাঁদতে, কেউ জানত না সেটা, আমি জানতাম। তোমরা সবাই আমাকে আনন্দে রাখতে চেয়েছ, স্বাভাবিক রাখতে চেয়েছ। অথচ আমি আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছি তোমাদের!

মাম, প্লিজ তুমি কাঁদবে না। ছোট্ট একটা ইচ্ছে ছিল আমার মাম— তোমাকে একটা কুচকুচে কালো শাড়ি কিনে দেব আমি। মাঝে মাঝেই তুমি মাঝরাতে ঘরে এসে মাথায় হাত রাখতে আমার। চোখে হাত রাখতে, গালে হাত রাখতে, ঠোঁটে হাত রাখতে। শাড়িটা পরে তুমি এভাবে একদিন মাঝরাতে আমার পাশে এসে বসতে, আমার মাথায় হাত রাখতে, ঠিক তখনই আমি তোমার হাতটা ধরে চমকে দিতাম তোমাকে। তারপর আলতো করে তোমার কোলে মাথা রেখে বলতাম—কালো পরি কালো পরি!

চিঠি পড়া শেষ করলেন রিমিকা বসু। ভাঁজ করে সেটা দু হাতের মাঝে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকালেন। চুপচাপ বসে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। বুকের ভেতর ঝড় বইয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি মাটির গভীরে শেকড় নামানো বৃক্ষের মতো অনড় হয়ে আছেন।

কপালে হাত রাখলেন তিনি রাহাদের। ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে শরীরটা। পায়ের কাছে নেমে যাওয়া চাদরটা দিয়ে শরীর ঢেকে দিলেন। কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকালেন না।

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বের হয়ে এলেন ঘর থেকে। ড্রইংরুমের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য উঠি উঠি করছে। পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে। ভোরের বাতাস বয়ে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। ওই যে চার রাস্তার মোড়ের লম্বা ইপিল ইপিল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, ওই যে রাস্তা দিয়ে সাইকেলে করে দৈনিক পত্রিকা নিয়ে যাচ্ছে হকার, জীবিকার তাগিদে অনেকে বের হয়েছে ঘর থেকে, স্বাস্থ্য রক্ষায় দৌড়াচ্ছেন কেউ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে— সবাই আছে, সবই আছে আগের মতো, কেবল রাহাদ নেই। চলে গেছে ও চুপচাপ।

'মাম!'

ঝট করে পেছনে তাকালেন রিমিকা বসু। এই প্রথম জলে ভরে উঠল তার দু চোখ। এই তো, এই তো কয়েকদিন আগেও বাসায় ঢুকেই চিৎকার করে ডাকত, মাম! কখনো কখনো চুপচাপ কিচেনে গিয়ে আলতো করে চোখ চেপে ধরত, কখনো আবার বাসায় ঢুকে বাচ্চাদের মতো কাঁথা মুড়ে দিয়ে শুয়ে থাকত তার বিছানায়।

আনিকার রুমে গেলেন রিমিকা বসু। ডেকে তুললেন তাকে। আনিকা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কোনো সমস্যা, আম্মু?'

কিছু বললেন না তিনি।

বেডরুমে গিয়ে স্বামীকে ডেকে তুললেন। আবিন চৌধুরী চমকে উঠে বিছানায় বসে বললেন, 'কী হয়েছে, রিমি?'

এবারও কিছু বললেন না তিনি। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। বিছানা থেকে নেমে কাঁধে একটা হাত রাখলেন আবিন চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠে মেঝেতে পড়ে গেলেন রিমিকা বসু।

সারাদিন আজ ঘুমিয়েছে অন্তী। অনেক দিন পর এভাবে ঘুমাল। আজকের বিকেলটা অন্যরকম, ঠিক কেমন যেন। জানালার পাশের তারে বসে অনেকক্ষণ ধরে একটা কাক চেঁচাচ্ছে। এক টুকরো বিস্কুট ছুড়ে দিল

কাকটার দিকে। কাকটা সেদিকে তাকালই না, চিৎকার করতে লাগল আগের মতোই।

বিছানার পাশ থেকে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল, না, কেউ কল করেনি। আবার জানালার পাশে দাঁড়াল অন্তী। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। দূরে অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে উড়ে যাচ্ছে।

কলিংবেল বেজে উঠল। অলস পায়ে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল সে। রিমিকা বসুকে দেখে চমকে উঠে বলল, 'ম্যাডাম, আপনি?'

ঘরে ঢুকলেন রিমিকা বসু। নিজেই দরজার লক লাগালেন। ফ্ল্যাটের চারপাশটা একবার দেখে একটা সোফায় বসে বললেন, 'তোমার নাম তো সোহানা, না?'

'না ম্যাডাম. সোহানা আমার নাম না।'

'তোমার তাহলে নাম কি?'

'পৃথুলা, মৃদুলা, সোহানা, জেসি—আরো অনেক নাম। সর্বশেষ অন্তী।'

'ছোটকালে রাখা তোমার একটা নাম আছে না?'

'ছিল।'

'ছিল মানে?'

'ভুলে গেছি।'

রিমিকা বসু সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অন্তীর কাঁধে একটা হাত রাখলেন। তারপর মমতা ভরা চাহনি দিয়ে আরো একটু কাছে টানলেন। অনেকক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি এ পথে কেন?'

কোনো কথা বলল না অন্তী। নিচু করে ফেলল মাথা। বেশ কিছুক্ষণ পর মাথাটা একটু উঁচু করে বলল, 'পৃথিবীর অন্যসব মেয়েরা যেজন্য এ পথে এসেছে, আমাকেও সেজন্য আসতে হয়েছে। প্রতারিত পুরুষ হয় হিংস্র, মেয়েরা হয় রাস্তার মানুষ। কোথাও তাদের ঠাঁই হয় না। অথচ সে হৃদয় দিয়েই ভালোবেসেছিল, মন উজার করেই আপন হতে চেয়েছিল।'

'বাসা থেকে পালিয়েছিলে?'

মাথা উঁচু নিচু করল অন্তী।

'তারপর কয়েকদিন একসঙ্গে সে আবার তোমাকে ছেড়ে পালিয়েছে।'

আবারও মাথা উঁচু নিচু করল অন্তী।

'বাড়িতে যাওনি?'

'না।'

'কেন!'

'যে বাবা এত আদর করে মানুষ করেছিলেন তার সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছে করেনি, তাকে আর লজ্জা দিতে ইচ্ছে করেনি।'

দু ঠোঁট পরস্পর চেপে ধরলেন রিমিকা বসু। অন্তীর কপালের নেমে আসা চুলগুলো আলতো তুলে দিলেন তিনি। তারপর মাথায় হাত রেখেই বললেন, 'রাহাদকে নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল, তার বদলে এই পুরো ফ্ল্যাটটা আমি তোমাকে দিতে চাচ্ছি, অন্তী।'

'ফ্ল্যাট দিয়ে কী করব আমি?'

'তুমি থাকবে।'

'রাস্তায় ঘোরা যার অভ্যাস হয়ে গেছে সে তো আর ফ্ল্যাটে ফিরতে পারে না, ম্যাডাম। কী দরকার এই খাঁচায় থেকে, অবারিত আকাশ আছে, এই শহরে এখনো অনেক থাকার জায়গা আছে, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আশ্রয় আছে।' ঘুরে বিছানার পাশে রাখা হাত ব্যাগটার দিকে তাকায় অন্তী।

'তুমি আরো একবার ভাববে?'

'আমাদের মতো মেয়েদের আর ভাবার কিছু নেই, ম্যাডাম। আমরা কেবল একটা জিনিসই ভাবি— অন্তত যতদিন বেঁচে আছি, প্রতারিত হয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।'

ভালো করে অন্তীর দিকে তাকালেন রিমিকা বসু। চোখ ফেটে আসতে চাচ্ছে। নিজেকে সংবরণ করলেন। একটু পর তার ব্যাগ থেকে একটা চেক বের করে বললেন, 'এটাতে সই করা আছে, তোমার যত ইচ্ছে টাকার অঙ্ক বসিয়ে তুলে নিও। ব্যাংকে বলে দেওয়া আছে।'

রিমিকা বসুর দিকে দু চোখ তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় অন্তী বলল, 'রাহাদ মারা গেছে, ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ।'

'মারা গেছে!' অন্তী হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, 'না ম্যাডাম, এটা হতে পারে না। পৃথিবীর ভালো মানুষগুলোকে স্রষ্টা এভাবে অসম্মান করতে পারে না। কখনো পাপ করেনি রাহাদ, ওর দ্বারা কোনো খারাপ কাজ করা অসম্ভব, ও কোনো অন্যায় ছুঁয়ে দেখেনি। কই, আমিও তো কখনো পাপ করিনি! আমাকে তাহলে এ পথে আসতে হলো কেন, আমি কেন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, আমাকে কেন শরীর বিক্রি করতে হয় প্রতিদিন!' অন্তী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'সব কিছু এমন হয় কেন?'

'প্রশ্নটা আমারও, অন্তী।'

বিছানার পাশ থেকে ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে অন্তী বলল, 'এখানে যা আছে সব কিছুই তো আপনার সাজিয়ে দেওয়া। রেখে যাচ্ছি। খুব

খারাপ লাগছে, ম্যাডাম। ওই জানালার পাশে আমি আর রাহাদ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম একদিন। এত সরল একটা ছেলে, কিন্তু ভালোবাসতো কত আন্তরিকতায়, কত উদারতায়। প্রতিটা পুরুষ কেন এমন না!'

জানালার দিকে আরো একবার তাকিয়ে চলে যাচ্ছে অন্তী। চেকটা বাড়িয়ে দিয়ে রিমিকা বসু বললেন, 'তোমার চেক।' চেকটা হাতে নিল সে। তারপর টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলে বলল, 'ভালোবাসার দাম কত? কত টাকায় একটা শুদ্ধ ছেলের কাঁধে মাথা রাখা যায়, তার হাতে হাত রেখে অবিরাম স্বপ্ন দেখা যায়, তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের অসহায়ত্ব লুকানো যায়। ম্যাডাম, আপনি জানেন?' নাক টানতে থাকে অন্তী, 'ভালোবাসা দেখানোর জিনিস না। রাহাদের সব ভালোবাসা আমার এই এখানে আছে, এই বুকে আছে, হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে আছে। থাক না। নিজেকে বিক্রি করে অনেক কিছুই তো পেয়েছি, ওটুকু না হয় ওমনি থাক।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে অন্তী। রিমিকা বসুর ঝাপসা চোখে এক সময় সে অদৃশ্য হয়ে গেল। চারপাশ সুমসাম। দেয়ালে ঘড়ির কাঁটার টিকটিক, আয়নায় আলোকচ্ছটা, মেঝেতে পায়ের অস্পষ্ট ছাপ। হঠাৎ জানালার দিকে তাকালেন তিনি। রাহাদ আর অন্তী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওরা হাসছে, কথা বলছে, একে ওকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি— না, টুকরো টুকরো বাতাস ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই, কিচ্ছু নেই!